দুরন্ত মন

দুরন্ত মন

রামপদ মুখোপাধ্যায়



শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস-সি
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট অঙ্কন :
শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
৫০বি, মধু রায় লেন, কলিকাতা

ব্লক প্রস্তুতকারক :
ব্লকম্যান
৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীমোদনারায়ণ দাস
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৪

মূল্য তিন টাকা

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত
শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের ঃ

পটভূমিকা, অনির্ব্বাণ, আবর্ত্ত, আলেখ্য, দুঃস্বপ্ন, আলপনার রঙ,
মহানগরী, মুহূর্ত্তের মূল্য, নিঃসঙ্গ, জীবন-জল-তরঙ্গ,
প্রেম ও পৃথিবী, মজা নদীর কথা,
শাশ্বত পিপাসা, মায়াজাল,
মেঘলা আকাশ,
কাল-কল্লোল,
ফানুস
ও
মনকেতকী

ইত্যাদি।

॥ ১ ॥

শুভ্রার কথা

আমার বয়স যখন দশ বছর তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা অসাধারণ নয়—তবু আমার স্মৃতিতে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

একদিন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন দাদাকে, উনিশ শো ত্রিশ সালে কি এমন ঘটনা ঘটেছিল ভারতবর্ষে যা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মত ?

দাদার বয়স ষোল বছর—ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে সে। ইতিহাসের অনেক গল্প তার জানা আছে, ভূগোল-পরিচয়ও নেহাত মন্দ নয়। তবু দাদা মাথা চুলকোতে লাগল। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে ভারতবর্ষেব কীর্ত্তি-কাহিনীর বিবরণ বড় একটা থাকে না। সেটা ছিল ইংরেজের রাজত্বকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ সবে কাহিল হতে সুরু করেছে, কিন্তু ফাঁকা মর্য্যাদায় তখনও সে ফাঁপা বেলুনের মতই অবিচল। তাদেব ইতিহাসে ভারতবর্ষ আর কতটুকু !

দাদা মাথা চুলকোতে লাগল—আমার পানে চাইলেন বাবা। কি রে খুকী, গল্পটা তো তোদের বলেছিলাম একদিন, মনে নেই ?

বললাম, সে তো গল্প বাবা—সত্যি নয়। যেমন সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প।

বাবা হেসে বললেন, পৃথিবীতে সুয়োরাণীরা আজো বেঁচে আছে। মানুষের মনের রাজ্যে তারা চিরস্থায়ী। আর যে গল্পটা বলেছিলাম—

জানি বাবা। গান্ধীজী—উনআশীজন লোক নিয়ে ডাণ্ডীযাত্রা করলেন নুন তৈরী করবেন বলে। নুন তৈরী মানে—আইন ভাঙ্গা।

সাবাস—পুরো নম্বর পেয়ে পাস করলি তুই, তোকে আমি ইস্কুলে পড়াব শুভ্রা। যতদূর তুই পড়তে চাস।

ওই বয়সেই ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করতাম—যতটুকু আমার সাধ্য। সংসারে মা একলা, ভাই বোনে আমরা অনেকগুলি। তাদের মধ্যে যারা ছোট সেগুলির বায়না আব্দার পূরণ করা—তাদের গা মোছানো—জামা পরানো—জল খাবার দেওয়া—কোলে করে এবাড়ী ওবাড়ী ঘোরা—কোন্ সাহায্যটা না করতাম।

বাবার প্রস্তাবে মা মুখ ভার করলেন। বললেন, লেখাপড়া শিখে মেয়েমানুষের কি হবে! ওকি চাকরি করবে?

বাবা বললেন, চাকরি করছে তো বহু মেয়ে। তারা কারও গলগ্রহ হয়ে থাকে না—তারা সংসারের বোঝা নয়—সহায়।

ওঃ—আমরা তো লেখাপড়া জানি না, কাজেই বোঝার সামিল! এত যে গতর জল করে খাটছি তোমার সংসারে—

তোমাদের কালে ঘরই ছিল সংসার—স্বামীর সেবাই ছিল পুণ্য কাজ। এখন ঘরের বাইরেও সংসার ছড়িয়ে পড়েছে, পুণ্য কাজের তালিকাও হয়েছে লম্বা। হেসে জবাব দিলেন বাবা।

বাবার মতটা বরাবরই উদার। উনি কলকাতায় চাকরি করেন বলে নয়। সেতো গ্রামের বহু লোকই করে। তারা শহরে যায় কিন্তু শহরকে ভাল করে দেখবার অবকাশ পায় না। পাড়া-গাঁয়ের এঁদো পুকুর—ঝোপঝাড়—কাদাভর্ত্তি সরু রাস্তা—এমন কি ম্যালেরিয়া পর্য্যন্ত এদের গর্ব্বের বস্তু। এরা শিক্ষিত—অর্থাৎ পাস করা, অথচ

বলেন, শহরের সবটাই মেকি। বাইরে চাকন-চিকন, ভেতরে খড় আর কাদা। ও ধার-করা দেঁতোর হাসি দেখে আমাদের মন ভোলে না। নেহাৎ পেটের দায়ে চাকরি—

বাবা বলেন, শহর সাজানো বটে—সজীবও। ওখানে সবাই চলে। যে নদীতে স্রোত বয়—তাতে জঞ্জাল কিছু থাকলেও সম্পদ বহুগুণে বেশী। ওখানে মাথার ওপর আকাশ কম—মানুষের মনে সে আকাশ অনেকখানি জুড়ে বসে আছে। ওখানে মানুষকে ছুঁয়ে মানুষ নোংরা হয় না, এক সঙ্গে খেতে বসে মানুষ খুঁত খুঁত করে না জাতিপাতের ভয়ে। ওখানে নিজের কথা ভাবে বটে মানুষ, পরের কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে না সে সর্ব্বক্ষণ। পাড়াগাঁ ছোট, শহর বড়। এ যদি হয় পাতকুয়া—ও তাহলে নদী।

বাবার কথাগুলির মানে তখন বুঝিনি, আজ বুঝি। বাবার উদার দৃষ্টির প্রশংসা করি। তিনি শহরে গিয়েছেন—পাড়াগাঁকে পিছনে বেঁধে নিয়ে নয়। পাড়াগাঁয়ে ফিরেছেন শহরকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁরই প্রসাদে—সংসারের বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে দাদার সঙ্গে সমান মর্য্যাদা লাভ করলাম। দাদা মনে মনে ক্ষুব্ধ হল বুঝলাম। ওর ক্ষোভটা ফুটে বেরুল টেষ্টের ফলাফল বার হলে। ম্যাট্রিকে বসবার অনুমতি পেল না দাদা।

মা বললেন, এ মাষ্টারদের অন্যায়, তুমি বলগে তাদের। খোকা তো বলছে—পরীক্ষা দিতে পাঠালে ও নিশ্চয় পাস করবে।

খোকার নিজের সম্বন্ধে ধারণা খুব উঁচু। কিন্তু উঁচু ধারণা নিয়ে থাকলে চোখ বুজেই থাকতে হয়। তাতে আকাশের চেহারাটা স্পষ্ট হয়—মাটির রূপটি ধরা পড়ে না। বাবা মন্তব্য করলেন।

তুমি বলবে না?

না। যদি নিজের মনে ওর উঁচু ধারণা থাকে—সত্যিকারের উঁচু ধারণা—তাহলে আসচে বার ভাল ফলই পাবে আশা করি।

পরের বার ফল হল আরও শোচনীয়। দাদা রাগ করে পড়া ছেড়ে দিল।

আমি ক্লাসের পর ক্লাস পেরিয়ে ম্যাট্রিক ক্লাসে পৌঁছলাম। শুধু পড়া নয়—বাবার উৎসাহে শিখলাম কিছু শিল্পকাজ—শিখলাম সামান্য গান বাজনা। ইস্কুলের সভাসমিতিতে প্রারম্ভ-সঙ্গীতে আমার যশ ছড়িয়ে পড়ল—সূচের কাজে কয়েকটি পদক পুরস্কার পেলাম। বাবার সঙ্গে বার তিনেক কলকাতা ঘুরে এলাম। শহরের মধ্যে দেখলাম—ভারতবর্ষের রূপ। সে কত বড়—কত বিচিত্র—কত না অদ্ভুত। কোথায় দেখলাম সেই রূপ? কলকাতার পথে—না প্রাসাদে? জনকোলাহলে, যানবাহনের গতিমুখে? আলোয়, শোভায়, সঙ্গীতে, না সৌন্দর্য্যে? দেখলাম ভারতবর্ষকে যাদুঘরে। আড়াই হাজার বছরের আগেকার ভারতবর্ষ। জৈন তীর্থঙ্কর আর বুদ্ধ মূর্ত্তির ক্ষমা-সুন্দর মুখমণ্ডলের প্রসন্ন প্রকাশে। আড়াই হাজার বছর আগেকার বাণী—জরা মৃত্যু দুঃখ জয়ের বাণী, যা মৌর্য্য সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং ভারত ছাড়িয়ে পৃথিবীর অর্দ্ধেকটা জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য্য—মথুরা তক্ষশিলা হরাপ্পা মাহেঞ্জদারো—এরাই তো ভারতবর্ষকে চিনিয়ে দিলে।

এসব চিনলাম—চিনলাম না শুধু কলকাতার পথ ঘাট। কোথা থেকে তার আরম্ভ—কোথায় বা শেষ তার হিসাব রাখা—বিশেষ করে চলন্ত ট্রামে বাসে বসে—আমার সাধ্যের বাইরে। এক পথের সঙ্গে আর একটা পথের চেহারার অদ্ভুত মিল। অসংখ্য উজ্জ্বল আলো—দু'ধারের অতিকায় অসংখ্য বাড়ী, দোকান, ট্রামের লাইন, বাড়ীর গায়ে পোষ্টার, সাইন বোর্ড—মন হারিয়ে যায় দৃষ্টির মধ্যে। দৃষ্টি দিশাহারা না হলে পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্রে বাঁধতে পারে না কেন কোন একটি বস্তুকে—কোন একটি চিহ্নকে? যদি চিনে রাখতাম এর পথ ঘাট, তাহলে এই কাহিনী প্রকাশ করবার সুযোগ আমার ঘটত না।

ম্যাট্রিকের দুয়োরে যখন পৌঁছলাম—আমার বয়স তখন আঠারো। এই সময়ে হঠাৎ একদিন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক আধ দিন নয়—দু'মাস পড়ে রইলেন বিছানায়। এবং বিছানা থেকে উঠেও সে অসুখের জের চললো আরও চার পাঁচ মাস। ডাক্তার বললেন, বাত। এই থেকেই আসে পক্ষাঘাত। খুব সাবধানে থাকবেন। আশা করি এই আক্রমণটা কাটিয়ে উঠবেন, কিন্তু সাবধান ভবিষ্যতের জন্য।

অসুখে খরচপত্র যা হল তার হিসাব সংসার চলা থেকে আন্দাজ করে নিলাম।

আমার ঘাড়ে পড়ল বাবার সেবা-শুশ্রূষার ভাব। তখন ডাক্তারী শেষ হয়ে কবিবাজী চলছে। ওষুধ তৈরী, অনুপান জোগাড় করা, সেঁক তাপ মালিশ—রীতিমত সমারোহ ব্যাপার। কোথায় রইল আমার পড়াশোনা—কোথায় বা পরীক্ষা পাসের কল্পনা।

বাবা একদিন বললেন অত্যন্ত দুঃখ করে, খুকী—আমিই তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট কবলাম। এই অসুখটা যদি না হত! আধা মাইনে পাচ্ছি এখন—হয়তো চাকরিও ছাড়তে হবে।

দাদা যে সংসারের ভার নেবে সে আশা কম। চাকরি ছাড়া আমাদের আর একটি আয় ছিল ধান জমির। সারা বছরের খোরাক হয়েও বেশ কিছু উদ্বৃত্ত হত। তাতে করে এক বৎসরের আলু কলাই গুড় কেনা থাকত ঘরে। ভরসা এখন জমিটুকু। কিন্তু বাইরের বাঁধা-ধরা আয় না থাকলে কি মূল্য জমির! এমনি ধারা আকস্মিক কিছু ঘটলে জমি হস্তান্তর করা ছাড়া পথ কি।

বাবা বললেন দাদাকে, অমু, জমিগুলোও অন্ততঃ দেখ—চাকরি যখন তুই করবি নে।

দাদা বলল, কে বললে আমি চাকরি করব না—আপনি চেষ্টা করেছেন কোন দিন?

কি চেষ্টা করব ? ম্যাট্রিকটাও যদি দিতিস !

কেন, ম্যাট্রিক পাস না করেও তো কত লোক কত কাজ করছে কলকাতায়। ওই বিনয়—লোকেন—মণ্টু—

দাদার কথায় বাধা দিয়ে বাবা বললেন, ওদের চাকরি কেউ খুঁজে দেয়নি—নিজেরা সব জুটিয়ে নিয়েছে। কি আর এমন চাকরি—কেউ কাপড়ের দোকানে, কেউ সিনেমা হাউসে, কেউ বা রেষ্টুরেণ্টে—

দাদা রাগ করে উঠে গেল। খেতে বসে মা'র কাছে বলল, বাবার ইচ্ছে নয়—আমি সিনেমায় কি রেষ্টুরেণ্টে কাজ নিই। ওঁর মান খোয়া যাবে যে !

সিনেমায় কি কাজ রে ? মা শুধোলেন।

কেন, দেখনি ছবিতে যারা প্লে করে ? ওদের এক একজনের এক মাসের মাইনে বাবার এক বছরের মাইনের চেয়ে বেশী।

মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন—আমরাও অবাক হলাম। কিন্তু বাবার মুখে ও সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে করে ও জগতে কেউ যাক এ ইচ্ছা হল না। পয়সাটাই কি জগতে সব ?

আমরা মেয়েরা কি চাই সংসারে—এ কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তো শতকরা নব্বুই জন মেয়ের মত আমিও বলব, চাই আমরা আত্মীয়-পরিজনভরা একটি গৃহ। রূপবান স্বাস্থ্যবান স্বামী—সুভাষিণী শ্বশ্রূ—আনন্দময় গৃহ। হয়তো সে গৃহে থাকবে একটি পূজার ঘর—রূপার বা পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম শিলা, থাকবে ধান্যরূপিণী লক্ষ্মীর ঝাঁপি—যার সম্পদ—কড়ি কৌটা পেঁচা সিঁদুরলেপা মোহর। থাকবে শাঁখ ঘণ্টা পানিশঙ্খ পিলসুজ ধূপদান, অর্ঘ্য রচনার পিতল থালিকা, কোশাকুশি, তাম্রটাট, চন্দন পিঁড়ি, কুশাসন। উঠানের এক প্রান্তে থাকবে একটি তুলসী-মঞ্চ। প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপের আলো নিয়ে সেই মঞ্চমূলে চলবে প্রণাম নিবেদন, প্রার্থনা। সারাদিনের

কাজের শেষে সুন্দর একটি প্রার্থনা।...রবীন্দ্রনাথের একটি গানের ছু' লাইন মনে পড়ছে ঃ

'সন্ধ্যাবেলায় ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথ বিরাম সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি।'

শহরের মেয়েরা কি প্রার্থনা করেন জানতাম না তখন। যে পরিবেশে আমি মানুষ হয়েছি—যে কথা মা ঠাকুরমা গ্রাম-বৃদ্ধাদের মুখে শুনেছি—আমার বাল্য থেকে যৌবন পর্য্যন্ত যে চিত্র দেখে দেখে মনের আকাশে রং ধরেছে—তাতে অন্য ছবি আঁকা চলে না।

অবশেষে বাবার কথাই ঠিক হল—বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে দেবার উদ্যোগ করলেন তিনি। আমার পরীক্ষা পাসের স্বপ্ন আকাশ-কুসুম হয়ে মিলিয়ে গেল।

হায়, এইখানেই যদি শেষ হত এই কাহিনীর! আমার ছুর্ভাগ্য-ক্রমে তা হল না—ঘটনা ভিন্নপথ রচনা করল।

বাবার অসুখের সময় বসু-পাড়ার নিমাই-জ্যেঠা খুব দেখা-শোনা করতেন। তাঁর ছেলে অনুপম আসত প্রতি রবিবার। আর অনুপমের সঙ্গে আসত আর একটি ছেলে ব্রজনাথ। ব্রজনাথকে বাবাই ডেকে পাঠান অনুপমের মারফৎ। ওদের বাড়ী ভিন্ন জেলায়, বাবার আপিসে কাজ করত। কলকাতার বাসায় থাকতেন ওর বিধবা মা, ছু'টি বোন ও ছোট একটি ভাই। ব্রজনাথ ছিল বাবার জুনিয়ার সহকর্ম্মী। কাজের খুঁটিনাটি কতকগুলি বিষয় ওকে জানানোর দরকার ছিল—ব্রজনাথেরও প্রয়োজন ছিল কাজ বুঝে নেবার। পরস্পরের দেখা-শোনার যোগাযোগটা অনুপমই ঘটালে। ব্রজনাথ কিন্তু আমাদের বাসাতে উঠল না। অনুপম ছিল ওর বন্ধু—কাজেই সেইখানে ও আশ্রয় নিল। প্রথম যেদিন ব্রজনাথ আমাদের

বাড়ীতে আসে, সেদিন ওর সঙ্গে ছিল অনুপম আর অনুপমের বোন সুমিতা। 'ওকে আমি ডাকতাম মিতা বলে—আমারই সমবয়সী ও। আমি অবস্থা বিপর্য্যয়ে ম্যাট্রিক দিতে পারিনি—সুমিতা দিয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মা বলতেন, ও মেয়ের কিছু হবে না, দিন রাত সাজন-গোজন নিয়েই আছে। সংসারে কুটোটি ভেঙ্গে দু'খানা করে না। আবার প্রতি রবিবার শহরে সিনেমা দেখে আসে।

শহর মানে মফঃস্বলের শহর। আমাদের কাছে-পিঠে একদিকে আছে কালনা অন্যদিকে নবদ্বীপ। দু'টোতেই সিনেমা আছে, এবং যে কোন বই এলে ভিড় হয় বেশ।

সুমিতা কতবার এসে ধরেছে, যাবি? তিনটেয় শো দিচ্ছে আজকাল। দু'টোর ট্রেনে গিয়ে ছটা পঁচিশের ট্রেনে ফিরে আসব।

দু' একবার গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। কিন্তু দু'খানা বই যা দেখেছিলাম ভাল লাগে নি। হাসি ইয়ার্কি ছ্যাবলামো নিয়ে রঙ্গরস জমানো, কেমন যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। এমন বেহায়াপনা নির্লজ্জ ভঙ্গি! ছবি শেষ হলে লজ্জায় চাইতে পারিনি মিতার দিকে। ছবির বেহায়াপনা দেখে আমিও যেন অপরাধী হয়েছি।

মিতা চিম্‌টি কেটে বলেছে, ইস্ তুইও শেষে মরালিষ্ট হলি? নির্দ্দোষ আমোদ হিসেবে ছবির গল্প নিতে শিখলি নে।

কি জানি মনটাকে তফাতে রেখে যারা ঠাট্টাতামাসা দেখে, কিংবা তরল আলাপ করে তাদের ঠিক বুঝতে প্পারি না। আমার মনের সঙ্গে সব কিছুই যে জড়িয়ে যায়—হাল্‌কা আলাপ আর দুঃখের বৃত্তান্ত সব কিছুই।

এর পর সিনেমার ডাক এলে মিতার সঙ্গী হইনি। মিতা রাগ করেছে, তবু না।

অনেকদিন পরে মিতা এল, তখন সবে সূর্য্য অস্ত গিয়েছে— আকাশে আলোর আভাস রয়েছে। চমৎকার অপরাহ্ণ। বর্ণে উজ্জ্বল, নরম মেঘে শীতল। মিতা ঘরে ঢুকে বলল, সঙ্গে অতিথি আছে দু'জন, আসন দে।

একটা টুল আর একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার ছিল। চেয়ারের উপর থেকে মালিশের সরঞ্জাম উঠিয়ে বললাম, এ ছাড়া ঘরে তো—

যথেষ্ট—যথেষ্ট। আহা-হা অত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে! বস্থন, বস্থন। পিছনের মানুষটি কথা কয়ে উঠল।

বাবা বালিশ ছেড়ে মাথা তুলে বললেন, ব্রজ এসেছ? বস—বস। অনুপম কই?

কাকীমার সঙ্গে কথা কচ্ছে। তা কাকাবাবু আমাকে এর আগে কেন খবর দেননি?

ভাবলাম—তুই এক সপ্তাহেই খাড়া হয়ে উঠব। এ যে এতটা ভালবাসবে তা ভাবতেই পারিনি বাবা। একটি অঙ্গে নয় বাবা— এ বাসা নিয়েছে অষ্ট অঙ্গে। আর কি চাকরি করতে পারব?

পারবেন—খুব পারবেন। আশ্বাস দিল ব্রজনাথ।

ওব গলার স্বরটি ভরাট—আশ্বাস দেওয়ার কালে বরদানের পর্য্যায়ে ওঠে। যদিও মানুষটি পাতলা ছিপ্ছিপে। পাতলা, কিন্তু রুগ্ন নয়। চিকন শ্যাম গায়ের রঙ—একটু লম্বাটে মুখ কিন্তু পৌরুষ-ব্যঞ্জক। পৌরুষ-কান্তিশূন্য পুরুষের মুখ—কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। আজ ভাবি বাইরের দেখা—বিশেষ করে প্রথম দেখা— মানুষকে স্বরূপে ফুটতে দেয় না। মানুষের আসল রূপ—তার চাল-চলন, তার সজ্জা-সৌষ্ঠব, তার বাহ্যিক শিষ্টাচার কোনটিতেই প্রকাশ করতে পারে না। ব্রজনাথ প্রথম দর্শনে আমার প্রীতি আকর্ষণ করল একথা অস্বীকার করব না।

কয়েকবার আসা যাওয়ায় ঘনিষ্ঠ হল ব্রজনাথ। অন্ততঃ আমাদের পরিবারের আপন জন হয়ে উঠল।

একদিন প্রস্তাব করল মিতা, জানিস ত—কাল আমরা কলকাতায় যাব ঠিক করলাম। ব্রজনাথবাবু গেল সপ্তাহে বলে গেছেন—আমাদের জু দেখিয়ে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাবেন বিকেল বেলায়। সেখান থেকে নৌকো করে ফিরব বেলুড়ে। বেলুড় থেকে ওঁদের বাড়ী বাগবাজার ফের নৌকোয়। বাগবাজারে মদনমোহনও দেখা হবে। দাদাও সঙ্গে যাবে।

বেশ তো।

বেশ তো নয়—তোকেও সঙ্গে নেব।

আমি! তা কি করে হবে—বাবাকে ওষুধ খাওয়ানো—সেঁক তাপ দেওয়া—

জ্যেঠামশায় নিজে থেকেই বললেন—ওকেও নিয়ে যাস। বললেন, আমাকে নিয়ে ওর ভাবনার অন্ত নেই—এইটুকু ঘরের মধ্যে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছে মেয়েটা—তোরা ওকে বেড়িয়ে নিয়ে আয়।

বাবাও জিদ ধরলেন। বললেন, ছ'টা দিন বইত না—তুই যা। কলকাতাটা দেখে আয় ভাল করে। আপিসে একটা দরখাস্ত করেছি ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌সানের জন্য। ব্রজ বলছিল—তোর উপস্থিতিও নাকি দরকার হবে। আমাদের সিনিয়র পার্টনার যা ভাল লোক, যদি কিছু গ্র্যাণ্ট করেন—

বুঝলাম এইদিক দিয়ে আমার যাওয়া দরকার। সুমিতা যদি নাই যেত সঙ্গে—সব সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়ে আমাকে কি সঙ্গী হতে হতো না ব্রজর?

ব্রজ শুনে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মতিবাবু—আপনি যাতে অর্দ্ধেক পেনসানও পান সে ব্যবস্থা করবই। শুভ্রা দেবী গেলে—আপনার কেস ষ্ট্রং হবে।

শেষ পর্য্যন্ত অনুপম আমাদের সঙ্গী হল না। বলল, আমি পরশু ফিরব কলকাতায়—ছুটি নিয়েছি সোমবারে। শনিবারে আমার সঙ্গেই তোরা ফিরে আসবি।

গ্রাম রইল পিছনে পড়ে—আমরা এগিয়ে চললাম শহরের দিকে। মধ্যম শ্রেণীর কামরায় আমরা ছাড়া কেউ ছিল না। সুমিতা ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে বসল ব্রজনাথের পাশে। বলল, যে ক'দিন থাকব রোজই একটি বই দেখাতে হবে কিন্তু! মেট্রোয় নিয়ে যাবেন তো?

নিশ্চয়। মেট্রো না দেখলে কলকাতায় আর দেখলে কি!

ওখানে তো শুধু ইংরেজি বই হয়।

ছবি দেখতে হলে ইংরেজি বই না দেখলে গল্পের রস পাবে না। প্যান্ প্যানানি বাংলা বইগুলো—যেন বর্ষাকালের জামরুল।

তারপর ছবির নামকরা আর্টিষ্টদের নিয়ে চলল ওদের আলোচনা। কে কোথা থেকে এসেছে, কেমন করে এসেছে—কোন্ ছবিতে নাম কিনল প্রথম, কোন্ নায়কের সঙ্গে কার ভালবাসা—অনর্গল প্রবাহে চলল ওদের আলাপ। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসি—অন্তরঙ্গতার নির্লজ্জ প্রকাশ। বেশ খানিকটা দূরে সরে বসলাম। জানালায় ঝুঁকে পড়লাম তু'ধারের সচল মাঠ বন কুঁড়েঘর আর মাঠেচরা গরু ছাগল দেখবার জন্য। কিন্তু ওদের হাসির তীর মাঝে মাঝে আমার বুকে এসে বিঁধতে লাগল। আমার চোখে অপরাহ্ণের নরম রোদ মসীলেপে একাকার হয়ে গেল। বাবার আর্থিক সদ্‌গতির আশ্বাস না থাকলে—যে কোন একটি বড় ষ্টেশনে নেমে পড়তে পারতাম অনায়াসে।

হঠাৎ অনেক আলো জ্বলে উঠল একসঙ্গে—ট্রেণের গতি মন্থর হল। সুমিতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—আমরা পৌঁছে গেলাম শু, তৈরী হয়ে নে।

শহরে সন্ধ্যা নেমেছে—দূরে একটা ক্লক টাওয়ারে তার ঘোষণা। কিন্তু শহরে কোনদিনই সন্ধ্যা নামে না। দোকানে দোকানে দিনের সমারোহ—যানবাহন রাজপথ সবই আলোয় আলোয় ঝলমল। অন্ধকারে যেমন পাড়াগাঁয়ের মাঠ বন পথ বাড়ী-ঘরদোর মুছে একাকার হয়ে যায়, তেমনি আলোয় আলোয় মুছে গেছে শহরের সব কিছু। সেই আলোর স্রোত বেয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম বাসায়।

একটি মাঝারি বাড়ীর একটি অংশে ব্রজনাথরা থাকে। দু'খানি ঘর—ফালি একটু বারান্দা—সঙ্কীর্ণ একটি রান্নাঘর—তারই একধারে একটি জলের টব বসানো। উঠোন নেই, আকাশ নেই। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা বাড়ীতে কোন মানুষও নেই। শুনেছিলাম ব্রজনাথের বিধবা মা, দুটি বোন, ছোট ভাই—আরও কে কে যেন আছেন, কিন্তু আপাততঃ কাউকে তো দেখছি না।

আমাকে অবাক হ'য়ে চাইতে দেখে ব্রজনাথ হয়তো আমার মনের কথা অনুমান করে নিল। বলল, মা পরশুদিন বরানগর গেছেন মামার ছেলের অন্নপ্রাশনে। কাল ফিরবার কথা ছিল, কেন যে ফেরেন নি ভাবছি। যাই হোক, আজ রাত্তিরে আর রান্নার হাঙ্গামায় কাজ নেই—দোকান থেকে খাবার আনিয়ে নিলেই চলবে। কি বল মিতা ?

সুমিতা মাথা নেড়ে বলল, ভালই হবে। শুনেছি কলকাতায় উনুন জ্বেলে রান্না করাটাই বোকামি। যে-কোন রেষ্টুরেণ্টে কি হোটেলে কিছু খেয়ে নিলেই যথেষ্ট।

আমি বললাম, যাদের কেউ নেই—তাদের ওসব সাজে। মেয়েরা যদি রাঁধতেই না শিখল—

তুই ন্যাকামো রাখ্ তো—কথা কইছেন যেন সাতকেলে বুড়ী! আমাকে ধমক দিল মিতা।

একটু হেসে বলল, কলকাতায় এসেছি কি হাতা-বেড়ি-কড়া ঠুন্‌ঠুন্‌ করতে—না বেড়িয়ে চেড়িয়ে সব দেখতে ?

ঠিক বলেছ মিতা—একথা আমিও স্বীকার করি। আপনি কেন রান্নার কথা ভাবছেন ? কাল হয়তো মা এসে যাবেন—সব ঠিক হবে'খন। ব্রজনাথ আশ্বাস দিল আমাদের।

চা এল দোকান থেকে, খাবার এল। ঘরের মধ্যে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসলাম আমরা। টি-পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে মিতা বলল, আসুন ব্রজবাবু—এ ক'দিনের টুর-প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলা যাক। আপিস থেকে ছুটি নিচ্ছেন তো ?

ছুটি! ব্রজনাথ হাসল। ছুটি না নিলেও চলবে। আমাদের দশটা-পাঁচটার বাঁধা আপিস হলেও কড়াকড়ি বিশেষ নেই। একবার সই করে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসতে পারলেই সারাদিন নিশ্চিন্ত। প্রোগ্রাম অনায়াসে করতে পারেন। মিস মিত্র—আপনি অত গম্ভীর হয়ে রয়েছেন যে ? ভাল লাগছে না বুঝি ?

না—ভালই তো লাগছে। অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলাম।

সত্য বলতে কি—ভাল লাগছিল না আমার। কোথায় যেন অসঙ্গতি—কোথায় যেন বাধা অনুভব করছিলাম। অনাত্মীয় যুবক ব্রজনাথ—পরিবারের কেউই নেই বাড়ীতে—আমরা দু'জন হলেও তরুণী কুমারী মেয়ে—লোক চক্ষে দৃশ্যটি কটুই। শহরে অবশ্য সমাজ নেই—প্রতিবাসীও প্রতিবাসী সম্বন্ধে নিস্পৃহ—, কিন্তু লোকাচারে অভ্যস্ত মনে কুণ্ঠার রাশি এসে জমছিল। সত্য কথা বলতে কি—ভয় ভয় করছিল। মিতা যতই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছে—ওর কথায় প্রগল্‌ভতা—আচরণে কুণ্ঠা-হীনতা যতই বাড়ছে—আমার মন ততই অজানা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠছে।

ব্রজনাথ বলল, আপনারা দু'জনে পাশের ঘরে শোবেন—দরকার হলে ডাক দেবেন। আশা করি কোন অসুবিধা হবে না।

দোর বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম দু'জনে। মিতা বলল, ব্রজনাথকে কেমন লাগছে? ভারি চমৎকার মানুষ, নয়? বাড়ীটাও বেশ নিরালা।

বললাম, কাল যদি ব্রজনাথবাবুর মা না আসেন—আমি দেশে চলে যাব।

ইস্—এত ভয়! মিতা খিল খিল করে হেসে উঠল। পুরুষ-মানুষকে তুই এত ডরাস! অথচ পুরুষমানুষ না হলে আমরা ঘর-সংসারেব কথা ভাবতেই পারি না।

কিন্তু অনাত্মীয় পুরুষ—

অনাত্মীয়—আত্মীয় হতে কতক্ষণ। বাপ মা যার সঙ্গে বিয়ে দেন—সে কি আগে থেকে জানা-চেনা কোন আত্মীয়? ওই অজানাই এক নিমেষে হয়—পরম জানা, বুঝলি? আমার গায়ে ঠেলা মেরে মিতা পুনরায় হেসে উঠল।

বললাম, বিয়ে হয়ে গেলে আলাদা কথা। শাস্ত্র মতে—

মিতা বলল, শাস্ত্রও তো আমাদের তৈরী—মন-বোঝানো জিনিষ। ভালবাসাটাই হল আসল। হাজার মন্ত্র পড়লেও দু'টি হৃদয় এক হয় না—যতক্ষণ না আসল মন্ত্রটি পড়া হচ্ছে। ওটি হচ্ছে ভালবাসা।

বললাম, ঘুম পাচ্ছে।

আমার কিন্তু কথা বলতে খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা শু, তুই কাউকে ভালবেসেছিস কখনো?

সে অবসর আর পেলাম কোথায়!

সে কি রে—রবি ঠাকুর কি বলেছেন জানিস না? আজ গাড়ীতে আসতে আসতে ব্রজ বেশ বলছিল—চমৎকার আবৃত্তি করে ও। বলে আবৃত্তি করল ঃ

পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

সবার মনেতেই ওর আসন পাতা।

বললাম, মাথাটা বড্ড ধরেছে মিতা—ঘুমুতে দে।

মিতা থামল—একটি লঘু নিশ্বাসও ফেলল। ও কি ব্যথা পেল আমার কথায়?

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত তখন গভীরই হয়েছে হয়তো। যান-বাহনের শব্দ কখনও অস্পষ্ট হয়ে বাজছে—কখনও বা পথচারীর ছু'একটি উচ্চকণ্ঠের মন্তব্য। বাইরের পথে হয়তো তেমনি আলোর প্রবাহ আছে—কিন্তু এ গলির মধ্যে রাজপথ লুপ্ত। পাশের ঘরে ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ হচ্ছে—কারা যেন চুপি চুপি আলাপ করছে। মিঠে একটু হাসির আওয়াজ, চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্‌ একটু রেশ। অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন চলাফেরা করছে—নিশ্বাস নিচ্ছে। স্বপ্ন তো দেখছি না! সারা গায়ে শিরশিরানি ভাব—দম যেন ফুরিয়ে আসবে এখনই। আড়ষ্ট হাতটাও নাড়তে পারছি না যে মিতাকে স্পর্শ করে ফিরে আসব জীবনের রাজ্যে। কিন্তু জীবনের রাজ্যে ফিরে আসা আমার চাই—এভাবে চাপা ভয়ে দম বন্ধ হয়ে মরতে পারব না। হাত উঠিয়ে—মিতার গায়ে একটা ধাক্কা দিলাম। হাতখানা আছড়ে পড়ল বিছানায়। মিতা নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার জড়ত্ব বা মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল—সবেগে উঠে বসলাম বিছানায়।

ঘরে আলো নেই—চারিদিকে অন্ধকারের সমুদ্র। সেই অকূল সমুদ্রে একা আমি ডুবে রয়েছি। দম নিচ্ছি ভেসে উঠবার জন্য, কিন্তু ক্রমশঃই তলিয়ে যাচ্ছি।

উপমায় পড়েছি—অকূল সমুদ্রে যেন একগাছি তৃণ—তাই দেখেও মানুষের মনে আশা জাগে কূলে পৌঁছবার। হঠাৎ ভেজানো ছুয়ারের

ফাঁকে তেমনি একটি আলোর লাইন—আমাকে আশ্বাস দিল। দুয়ার খুলে বাইরে এলাম। বারান্দায় কমজোরী আলোটা জ্বলছে—পাশের ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হল।

মিতারই গলা শুনলাম, স্পষ্ট, নির্ভুল। তার সঙ্গে ব্রজনাথের গলা। নূতন আতঙ্কে—শিরায় শিরায় কাঁপুনি সুরু হল। টলে পড়ছিলাম—সামলে নিলাম কপাট ধরে। কপাট ঠকাস্ করে আছড়ে পড়ল দেয়ালের গায়ে।

মিতা এসে আমায় ধরল। তারই কাঁধে ভর দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। ব্রজনাথ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। মিতা আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলো—শু—শু—

আমি চোখ চাইতেই ব্রজনাথ বলল, ভারি নার্ভাস তো আপনি। কোন খারাপ স্বপ্ন টপ্ন দেখেছিলেন বুঝি? না ভূতের ভয়?

মিতা বলল, কতক্ষণের জন্যই বা ও-ঘরে গিয়েছি—বড় জোর তিন মিনিট। তারই মধ্যে এত কাণ্ড! একেবারে খুকী তুই! কেন যে তোরা বাইরে বা'র হস!

ব্রজনাথ বলল, বলেন তো বারান্দায় একটা টুল টেনে নিয়ে বসি। রাত তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

না—না, তুমি যাও, শোওগে। কাল বেড়াবার প্রোগ্রামটা মাটি করো না। মিতা তাড়াতাড়ি বলল।

ব্রজনাথ উঠল। মিতা বলল, তোমার ওষুধটা লেগেছে বোধ হচ্ছে—গলা জ্বালা আর টের পাচ্ছি না।

ব্রজনাথ বলল, ওষুধ আমি ভাল দোকান থেকেই কিনি—সস্তা দামের জিনিষ নয়।

দোর বন্ধ করে আলো নিভিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়ল মিতা। বলল, কি ভীতু রে তুই! ভদ্দরলোক কি মনে করলেন বল্ তো? পাড়াগাঁয়ের লোকেদের মনে নানান কুসংস্কার—ভূতের ভয়।

ততক্ষণে মনকে স্ববশে এনেছি। নৈতিক বলও ফিরে পেয়েছি। দৃঢ়স্বরে বললাম, এত রাতে ও-ঘরে কেন গিয়েছিলে মিতা?

ওই তো বললাম—দোকানের খাবার খেয়ে বোধ করি অম্বল হয়েছিল—বুক জ্বালা জ্বালা করছিল। তাই—

বললাম, না—তা নয়।

মিতা বলল, এ কথাব মানে? ওব শুকনো গলার স্বরে বুঝলাম ভয় পেয়েছে।

বললাম, তিন মিনিটও তুমি ও-ঘরে যাওনি।

মিতা হঠাৎ উষ্ণ হয়ে বলল, দেখ শু, সব ছেলেমিরই একটা সীমা আছে। তুমি নিশ্চয় আমার গার্জ্জেন নও!

বন্ধু বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

না, বন্ধুবা এভাবে কৈফিয়ৎ চায় না। একটু থেমে বলল, যে মেয়ের মধ্যে নৈতিক বল নেই—তারাই এভাবে সন্দেহ করে অন্য মেয়েকে। অনাত্মীয় পুরুষ? হলই বা, মেয়েরা কি সাবানের ফেনা—যে একটু বাতাস লাগলেই ভেঙ্গে পড়ে!

বললাম, মিতা—কেন রাগ করছিস—আমি তো মন্দ ভেবে কিছু বলিনি।

মিতা ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে। হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কাল যদি ব্রজনাথকে আমি বিয়ে করি—তাহলে তোমাব সন্দেহ থাকবে কোথায়? যদি আমি ভালবাসি ব্রজনাথকে কে আছে পৃথিবীতে যে এ মিলনে বাধা দিতে পারে? আমি খুকী নই—নিজের ভালমন্দ বুঝি।

এ কথার কোন জবাব নেই। যদি কোন প্রত্যুত্তর করি—মিতার উত্তেজনা বাড়বে এবং উত্তেজনাব বশে মিতা এমন কাজও করতে পারে যা কোনদিন ভাবতে পারিনি আমি। জানি না—মিতা ব্রজনাথের বাগ্‌দত্তা কিনা? তাই যদি হয় তো এভাবে পরিবারহীন নির্জ্জন

বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে এত ছলছুতার আশ্রয় গ্রহণ করবে কেন ওরা ? এই জালে আমিও যে জড়িয়ে পড়ছি ক্রমশঃ।

প্রভাত হল। মিতার মুখভার আর ঘুচল না। ব্রজনাথও কেমন গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে লাগল। মিতাকে উদ্দেশ করে বলল, মা কখন আসবেন জানি না, তোমরা কি হোটেলেই খাবে ?

আমার আপত্তি নেই। মিতা উদাস স্বরে বলল।

মিস মিত্র—আপনি ?

আমায় দয়া করে একবার বাবার আপিসে নিয়ে যাবেন ? ওঁর পেনশন সম্বন্ধে—

ও—সে তো আজ হবে না। আজ আর কাল আমি ছুটি নিয়েছি আপিস থেকে। শরীর খারাপ হলে কি আপিস যাওয়া চলে ! একটু থেমে বলল, হোটেলে খেতে আপনার আপত্তি নেই তো ?

আপনার ভাঁড়ারে সবই তো মজুত—অনায়াসে তৈরী করে নেওয়া যাবে কিছু।

বেশ তো—বেশ তো—আমি তাহলে বাজার করে আনি। ব্রজনাথ উৎফুল্ল হয়ে বা'র হয়ে গেল।

মিতা আমার কাছে এসে আমার একখানি হাত টেনে নিয়ে বলল, রাগ করিস নে শু। এসেছি কলকাতা দেখতে—আমোদ-আহ্লাদ করতে, মিছিমিছি মন খারাপ করে সব নষ্ট করে দিস নে।

ওর কাতর অনুনয় আমার মনটাকে নরম করে দিল। চোখের কোণে জল এল—গলা বন্ধ হয়ে গেল জমানো বাষ্পে। কোন মতে বললাম, না, রাগ করি নি।

বেশ চলল সারাদিন। চিড়িয়াখানার রাজ্যে এসে—মানুষের মনোজগতের খবর ভুলে গেলাম। প্রকৃতি আর পশুর সঙ্গ অনেক সময় মনের ক্ষত নিরাময় করে। মূক ও মৌন এরা—বাক্-বিভূতিতে মুগ্ধ করে না মন—আর্দ্রবায়ুর মত এদের ক্রিয়া—নিদাঘ দুপুরে হঠাৎ

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে যেমন মেদুর-পরিবেশে প্রসন্ন হয়ে ওঠে ধরণী।

অপরাহ্ণে চমৎকার ব্যাণ্ড বাজছিল—ঘাসের ওপর পা বিছিয়ে আমরা উপভোগ করলাম সেই সুর। একটা রেষ্টুরেণ্টে কিছু খেয়ে—সান্ধ্য-প্রদর্শনীতে এলাম মেট্রোয়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত চমৎকার ঘর। কি জানি কেন—এখানে বসে গ্রামের কথাই খালি মনে পড়ছিল। পর্দ্দার গায়ে কি ছবি ফুটল—কেন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হল প্রেক্ষাগৃহ—কেনই বা উল্লাস উচ্ছ্বাস অগণিত দর্শকের—বুঝলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, এ ছবি আমাদের জীবনের কথা বলে না, এ ছবি আমাদের রুচিকে পরিতৃপ্ত করে না—আমাদের রসবোধকে জাগ্রত করে না।

মিতা বলল, চমৎকার! সত্যিকারের জীবন উপভোগ করতে পারে ওরাই। সমাজের শাসন ওদের পঙ্গু করতে পারে না।

তার পরদিন গেলাম দক্ষিণেশ্বরে। অপরাহ্ণে নদী পার হয়ে বেলুড়। বিস্তীর্ণ গঙ্গার জলে শান্ত অপরাহ্ণের ছায়া—গঙ্গার কূলে এখানে ওখানে অতিকায় মিল—সুদৃশ্য মন্দির। দক্ষিণেশ্বরকে অনুকরণ করার চেষ্টা। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সাধক—

মিতা বলল, চমৎকার সিনারি! আচ্ছা এখানের ছবি উঠেছে কোন বইয়ে—

ব্রজনাথ বলল, উঠেছে বৈকি।

মন্দির দেখেও মিতা খুশী হল। বলল, দক্ষিণেশ্বরের চেয়ে এখানটা বেশ লাগছে। বেশ জমজমাট ভাব।

সন্ধ্যার পর নৌকা করে বাগবাজারে ফিরলাম। সে দিনও ব্রজনাথের মা এসে পৌঁছুলেন না।

মনে করেছিলাম—আজ আর কোন চিন্তাকে ঠাঁই দেব না, আরাম করে ঘুম দেব। শরীর তো যথেষ্টই ক্লান্ত রয়েছে। কিন্তু কেমন অভ্যাস – রাত্রির মধ্যযামে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে অন্ধকার—পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে মিতা। ওব নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। গভীর নিদ্রার স্বপ্নহীন রাজ্যে ও চলে গেছে। আমার মনও চলে গেল কল্পনার রাজ্যে। কিন্তু কি কুৎসিত কল্পনা! এ চিন্তা কখনও তো করিনি। কাল রাত্রিতে ও ঘবে কি বহস্য সংঘটিত হয়েছিল—তার তত্ত্ব কেন অন্বেষণ কবছে মন? কেন ব্রজনাথ আব মিতাকে নিয়ে আকছি একটি মিলনান্তক চিত্র? মিতার হাসির ধ্বনি এসে কানে বাজছে—ব্রজনাথেব অস্ফুট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মেঘ গর্জ্জনেব সঙ্গে দামিনী-স্ফুরণ ও লঘুবর্ষণ। চ্যুতমুকুলগন্ধে আমোদিত প্রান্তব—মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নায় সহকাব শাখায় প্রচ্ছন্ন-তনু কোকিলেব ক্ষণবিবতিময় কুহুধ্বনি। আব মিতাব সেই আবৃত্তি ঃ

বিশ্বময় দিয়েছ তাবে ছড়ায়ে।

আশ্চর্য্য, কুমাবী মনেব গভীবে কোথায় ছিল এই আবেশ-মধুব বসন্ত দিনেব একটি মুহূর্ত্ত! এই উত্তাপ আব অনুবাগ? এই অভিসাব-উন্মুখ চিত্ত? পার্থিব শিবপূজা ক'বে কামনা কবে কুমাবী মেয়ে—সুন্দব তনু- ক্ষমাময়- প্রসন্ন চিত্ত—উদার আত্মভোলা পুরুষ। চিন্তায়, স্বপ্নে, কর্ম্মে ও বিশ্রামক্ষণে তাকে কামনাব রঙে ও বেখায় সম্পূর্ণ কবে নিতে থাকে প্রতিদিন। মিতাকে আশ্রয় কবে আমি—আমিই তো বা'ব হয়ে এসেছি আমাব খোলস থেকে। সেই উগ্র কামনায় ছেয়ে গেছে চিত্তভুবন।

অস্ফুট চীৎকাব করে চোখ বুজে ডুব দিলাম সেই অন্ধকাব সমুদ্রে।

পরের দিনও ব্রজনাথের মা ফিরলেন না। যথারীতি রান্না খাওয়া সারা হলে ব্রজনাথ বলল, তৈরী হয়ে নাও মিতা—আজ অনেক দূরের পাল্লা।

মিতা বলল, শুয়ে পড়লি যে?

শরীরটা ভাল নেই—তোরা বেড়িয়ে আয়। আর দু'একবার অনুরোধ করে মিতা চলে গেল। সিঁড়িতে ওর লঘু পদক্ষেপ ও চটুল আলাপ কানে এল। বুঝলাম—ব্রজনাথকে একান্তে পেয়ে ও খুশীই হয়েছে।

ওদের সঙ্গে গেলাম না বটে, ওরা রইল আমার সঙ্গে। দূর পথে দীর্ঘ পরিক্রমায় আলোয় ছায়ায় ব্রজনাথ আর মিতা হাত ধরাধরি করে চলল। ওদের কল-গুঞ্জনে আচ্ছন্ন হল শ্রুতি। মনের রথে দৃষ্টি আর শ্রুতি দুই বেগবান অশ্বকে জুড়ে দিয়ে সুরু হল আমার বিশ্বভ্রমণ।

অনেক রাত্রিতে ফিরল ওরা। বলল, রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে এসেছি। অত্যন্ত ক্লান্ত—একটু ঘুমোতে চাইল।

আশ্চর্য্য, আজও ঘুম ভেঙ্গে গেল মাঝরাতে। বাইরে নিস্তব্ধ পৃথিবী—ঘরে অন্ধকার।

পাশে অভ্যাসমত হাত দিয়ে অনুভব করতে চাইলাম মিতার সান্নিধ্য। ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। মিতা নাই। মাথার মধ্যে রক্ত উঠল চন্ চন্ করে! কি করব—কি করব আমি? এতো মিতার অভিসার নয়—এ যে আমারই মৃত্যু। মনের মাঝে শিহরণ—উত্তেজনা—আবেশ উন্মাদনা। না, না, কালই পালাব এখান থেকে। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব—আমি ফিরে যেতে পারব না আমাদের ঘরে।

মিতা ফিরে এল। সন্তর্পণে দুয়ার বন্ধ করল। শুয়ে পড়ল সন্তর্পণে। আস্তে আস্তে একখানি হাত দিয়ে আমায় স্পর্শ করল। নিঃসংশয় হল আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

সকালে উঠে বললাম, আজ বাবার আপিসে নিয়ে যাবেন আমাকে ? দরখাস্ত দিয়েই আমি চলে যাব বাড়ী।

থাকবেন না আর ছুটো দিন ? কাল তো দেখলেন না কিছুই। ব্রজনাথ বলল।

না—ভাল লাগছে না। বাবা হয়তো কত ভাবছেন।

কে বলেছে আপনাকে ? আর তিনি তো দেশে নেই—চেঞ্জে গেছেন রাজগীরে।

চেঞ্জে গেছেন ? হঠাৎ ?

কাল অনুপমের চিঠি পেলাম। এই দেখুন। ওতো লিখছে—ওখানকার কে ডাক্তারবাবু—তিনি জোর করে ওঁকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন—Hot water spring-এ মাসখানেক ধরে স্নান করলে বাত আরাম হয়ে যাবে। এর পর তিনি চাকরি করতে পারবেন—ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌সন নিতে হবে না। অনুপমও ওঁদের সঙ্গে গেছে কিনা তাই আরও এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে সে।

চিঠিতে এর বেশী কিছু ছিল না। তবু বিশ্বাস হল না ব্রজনাথের কথা। মনে হল —আমার চারিদিকে যেন ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হচ্ছে। মিতা পর্য্যন্ত সেই জালের বুনোনের কাজ করছে। মাত্র চারদিন হল দেশ ছেড়ে এসেছি —এর মধ্যে……? না, না, আমাকে ফিরতেই হবে।

আজও ব্রজনাথের মা ফিরলেন না। জানি কোনও দিনই উনি ফিরবেন না। অন্ততঃ আমরা যতদিন এখানে থাকব। আশ্চর্য্য, একেই বিশ্বাস করেছে মিতা—একেই ভালবেসেছে ?

আজও ওদের সঙ্গে গেলাম না বেড়াতে। আজ সঙ্কল্প করেছি—পালাব এখান থেকে। কোন মতে পথ চিনে পৌঁছতে পারব না কি ষ্টেশনে ? একখানি টিকেট কিনে চাপতে পারব না কি দেশের গাড়ীতে ? দেখা যাক কি হয়।

ওরা চলে গেলে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার ভাল শাড়ীটা রয়েছে মিতার স্যুটকেসে—চাবি বন্ধ। থাক। টাকা? সেও হয়তো স্যুটকেসে আছে। কিংবা ব্রজনাথের পকেটে। টেবিলের উপর মাত্র দু'টো আনি রয়েছে। ওতে বড় জোর ট্রামে করে হাওড়া পৌঁছতে পারব। তারপর? যাই হোক অদৃষ্টে—এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র থাকব না। এখানে থাকলে কোন কালেই ফিরে যেতে পারব না দেশে।

বেশী উত্তেজনায় বিবেচনাশক্তি লোপ পায়। আমারও তাই হল। বাগবাজার থেকে ট্রামে চেপে যেখানে পৌঁছলাম—সেটি হাওড়া ষ্টেশন নয়। একটা বড় পুকুর ঘিরে খানিকটা বাগান। তার চারধারে ট্রাম লাইন—আর বড় বড় ইমারৎ। এ পথে যেমন গাড়ীর ভীড়—তেমনি মানুষের চাপ। পথের এধার থেকে ওধারে যাওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কন্‌ডক্‌টর বলল, ট্রামের যাত্রা শেষ হল— ট্রাম ফের যাবে বাগবাজারে। নামবেন কি?

নামলাম। কিন্তু কোথায় যাব? পথ পার হওয়ার চেয়ে পুকুর-ধারে গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিই। সেই ভাল—ওখানে বসেই হাওড়া যাবার পথ ঠিক করে নেব।

কতকগুলি পাম জাতীয় গাছ মিলে ঘন ছায়া বিস্তার করেছে এক জায়গায়। গাছের উপর গোটা কয়েক কাক বসে আছে—নীচেয় কেউ নেই। গিয়ে বসলাম তার ছায়ায়। আর বসতেই শির্‌শিরে হাওয়ায় দেহটা জুড়িয়ে গেল। উত্তেজনা হ্রাস হতেই আলস্যে ঝিমিয়ে এল দেহ—দু'টি চোখ জুড়ে নামলো ঘুমের বন্যা। কখন যে তলিয়ে গেলাম—তার টানে···

চোখ চেয়ে দেখি—চারিদিকে কোমল আলো—দীঘির জলে রোদ চিক্ চিক্ করছে না। রাজপথে মানুষের স্রোত উত্তাল হয়ে উঠেছে—এবং দীঘির পাড়ের পথ বেয়েও চলেছে মানুষ। ছুটি হল কি

আপিসের ? ঘরে ফিরে চলেছে এরা ? ঘর ? হু-হু করে দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল। কোথায় আমার ঘর ? কেমন করে পৌঁছব সেখানে ? অকরুণ রাজধানীতে কে দেবে আমাকে আশ্রয় এবং আশ্বাস ?

বেলা শেষ হয়ে আসছে--পথের ধারে ঝাঁকড়া গাছটায় ফিরে আসছে পাখীর ঝাঁক। কাকেরা সুরু করেছে কোলাহল। দিনের সুরুতে আহার অন্বেষণে যাবা দিকদিগন্তরে ছুটেছিল—দিনান্তে তারা একই আশ্রয়ে এসে মিলছে। পাখীর জগতে এই মিলনের মূল্য কতটুকু ! সুখ দুঃখ বেদনা আনন্দ ওদেব কতখানি বিচলিত করতে পারে ?

কিন্তু তবু ওরা সুখী—ওরা সুখী। ওরা ঘরে ফিরল প্রিয় পরিজনের সঙ্গে মিশল, বিচ্ছেদভারাতুর দীর্ঘ দিনের দুঃসহ প্রতীক্ষা শেষ হল ওদের। আর আমি ! দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। যত চেষ্টা করি কান্না চাপতে ততই দুর্ণিবার বেগে ঠেলে ঠেলে ওঠে কান্নার সমুদ্র। সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হব এমন সাধ্য আমার নেই।

॥ ২ ॥

প্রদ্যুম্নর কথা

অসিত আর আমি আপিস থেকে ফিরছিলাম। নতুন একটা কাজের চাপে—ছুটির পরও খানিকটা থাকতে হয়েছে। এমন প্রায়ই হয়। নিয়ম আছে দশটা পাঁচটা আপিস। হাজিরা দেবার বেলায় মিনিটের হিসাব কড়া ভাবে রাখা হয়—ছুটির বেলায় কিন্তু ঢিলেঢালা ব্যবস্থা। বরাদ্দ ছাড়া থাক না দু'এক ঘণ্টা—, কোম্পানী বলবে না—কেন রয়েছ? মাইনে চাইলেই অবশ্য মুশকিল। কে বলেছে তোমাদের থাকতে? রুটিন মাফিক কাজ—এ তো ঘণ্টা মিনিটের হিসাবে বাঁধা। এতে বেশী থাক তোমারই অপটুতা·প্রমাণ হবে।

দেরী হয়েছিল বলে লালদীঘির মাঝখান দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অসিত। আমার হাতে টান পড়ল। ব্যাপার কি?

অসিত আঙ্গুল দিয়ে পামকুঞ্জ নির্দ্দেশ করে বলল, ঐ দেখ—একটি মেয়ে বসে বসে কাঁদছে।

কাঁদছে তো কাঁদছে— আমাদের কি? পৃথিবীতে কত মানুষই তো অহরহ কাঁদছে—ক'টি মানুষ সে সব কান্নার বৃত্তান্ত নিয়ে মাথা ঘামায়! যাঁরা অবশ্য পরের বেদনাকে মন দিয়ে নিতে পারেন—তাঁদের কীর্ত্তিকাহিনী আমরা বইতে পড়ে থাকি। কিন্তু আমরা তো অতি সাধারণ মানুষ—আমাদের দুপাশে কান্নার স্রোত বয়ে

গেলেও তা ঠেলে ঠেলে এগুতে হবেই। পরের চোখের জল মোছাবো কি—নিজের চোখের জলেই যে নদীর স্রোত বাড়িয়ে দিচ্ছি।

অসিত বলল, চল, দেখি এগিয়ে—মেয়েটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসিতের অনুবর্ত্তী হলাম। আমাদেব পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল মেয়েটি। অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বেশবাস ঠিক করতে লাগল। অপ্রতিভ হয়ে আমি অসিতের হাতে টান দিয়েছি এমন সময় কান্না-ভেজা গলায় ও ডাকল, শুনুন। মুখ ফেরাতেই ত্ব'হাতে মুখ ঢেকে ও আরও জোরে কেঁদে উঠল।

কি বিপদ! কাছে ডেকে এমন ধারা কান্নার অর্থই বা কি! যদি কোন বিপদে পড়ে থাকে—সেকথা সোজাসুজি জানালেই তো হয়।

অসিত বলল, আমাদেব কিছু বলবেন কি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। নড়ে চড়ে বসল। বুঝলাম ভিতরেব অশান্ত ভাবটিকে দমন করছে।

মেয়েটি বলল, আমি বড় বিপদে পড়েছি। নতুন এসেছি কলকাতায়, পথঘাট কিছুই চিনি না—

একলাই এসেছেন? অসিত জিজ্ঞাসা কবল।

খানিক চুপ করে থেকে বলল, না, সঙ্গে যিনি ছিলেন—আমাকে এইখানে বসিয়ে রেখে কোথায় যেন গেলেন। চাব পাঁচ ঘণ্টা ধবে ঠায় বসে আছি, এখন কোথায় যাব আমি। আবার ত্ব'হাতে মুখ ঢাকল মেয়েটি।

শঙ্কিত কণ্ঠে বললাম, কলকাতাব রাস্তা—গাড়ী চাপা পড়াও বিচিত্র নয়। যাই হোক, সন্ধ্যে না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন কি? না হাসপাতালে খবর নেবেন?

মেয়েটি কাঁদ-কাঁদ মুখে বলল, যা করবার করুন আপনারা। আমার হাত পা কাঁপছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে কলকাতায় আসেন নি?

এসেছি বইকি—বাবার সঙ্গে। পায়ে হেঁটে কখনও তো বেড়াইনি, এখানকার পথঘাট চিনি না।

আপনাদের দেশ কোথায়?

দেশ আমাদের বহুদূর—কাটোয়া লাইনে। ষ্টেশন থেকে হেঁটে যেতে হয় চার মাইল। মেঠো পথ। আলের রাস্তা। যতবার এসেছি গরুর গাড়ীতে করে -

তাহলে উপায়? অসিতেব পানে চেয়ে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলাম।

অসিত মাথা চুলকে ইসারায় জানাল—তাইত!

অবশেষে বললাম, বলেন তো আপনাকে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিতে পারি।

রাত্তিরে যাওয়ার অসুবিধা বললাম তো। সন্ধ্যের গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছবে রাত দশটায়—অত রাতে একলা কোথায় যাব! বিপন্ন মুখে ও জানালো।

অসিতের পানে চেয়ে বললাম, তুই পারবি—আজকের মত এঁর থাকবার ব্যবস্থা করতে?

আমি থাকি মেসে—সেখানে কি ব্যবস্থা করতে পারি! অসিত বলল। তার চেয়ে তোর ওখানে নিয়ে যা। থাকিস তো মাসীর বাড়ী, সেখানে বরঞ্চ—

মেয়েটিকে বললাম, আপনার কোন ভয় নেই—আর পনেরো মিনিট আপনার আত্মীয়ের জন্য অপেক্ষা করব—তারপর আমাদের সঙ্গেই যাবেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে সাহস হবে তো আপনার?

আপনারা ভদ্র ছেলে—চাকরী করেন আপিসে—আপনাদের ভয় কি ? মেয়েটি অকপট কণ্ঠে বলল।

একটু সরে এলাম অসিতকে নিয়ে—একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললাম অসিতকে, ভেবে দেখ—অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ে—কে কোন ফিকির খুঁজছে জানি না, ওকে আশ্রয় দিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব না তো ?

অসিত বলল, এতখানি বয়স হ'ল—লোকচরিত্রে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। মেয়েটি নির্দ্দোষ, একথা ওর মুখ চোখ—গলার স্বব পর্য্যন্ত বলে দিচ্ছে।

বেশ, আশ্রয় যেন দিলাম—কাল যদি ওকে ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে না পারি—কিংবা আর কোন গোলযোগ ঘটে ?

মনে তো হয় না -কিছু ঘটবে। আচ্ছা সে সব ভাবা যাবে পবে —আপাতত ওকে নির্ভয় কব তো।

মেয়েটিকে নিয়ে এসে তুললাম আত্মীয় বাড়ীতে। টালিগঞ্জ অনেকখানি দূব ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে, ট্রামে একটানা পথ। বাড়ীর মালিক—সম্পর্কে আমার মাসীমা হন। বিধবা। কাছেপিঠের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই—ছেলে মেয়ে তো নয়ই। কিন্তু উপার্জ্জনের পথটি তাঁর বন্ধ হয়নি। এই দোতলা বাড়ীখানি—উপার্জ্জনশীল পুত্রেব চেয়েও বেশী। উপর নীচের ছ'খানি ঘর—ছ'খানিই ভাড়া দিয়েছেন। নিজে থাকেন তিন তলায়--চিলে কোঠায়। দূর সম্পর্কেব আত্মীয় বলে মেয়েছেলে না থাকলেও আশ্রয় দিয়েছেন আমাকে। অবশ্য ঘরের ভাড়া আমাকে নিয়মিত দিতে হয়; অনাথা মানুষ—আয়ের পথটি বন্ধ করে তো স্নেহ ভালবাসা বিল্যোতে পারেন না। রাত্রিতে ওঁরই কাছে আহার করি—সেজন্য কিছু অর্থ দিই। সকালেও আহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু বিধবা মানুষকে আপিসের সময় ভাত দেওয়াটা জুলুম বলে মনে হওয়ায় অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি।

তবু স্নেহবশে যেদিন কিছু তরকারি রান্না হয়ে ওঠে—আমার পাতে দিয়ে যান মাসীমা। আমার তো ইক্‌মিক্ কুকার সম্বল—সিদ্ধ পক্কের বেশী কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

মাসীমাকে বললাম সব কথা। শুধু একটা রাতের মত আশ্রয় চাই।

মাসীমা বললেন, আমার মনে হয়—সোমত্থ মেয়েকে একলা গাড়ীতে তুলে দেওয়া ঠিক নয়। মেয়েটি দু'চারদিন থাকুক এখানে। তুই বরঞ্চ ওদের আত্মীয়ের খোঁজখবর করে চিঠি লেখ্, তাঁরা যেন ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

বললাম, তাই হবে মাসিমা, কালই আমি চিঠি লিখব।

সকালে মুখ হাত ধুয়ে জামাটা গলা গলিয়ে চটিটা টেনে নিয়েছি দোকানে চা-পর্ব্ব শেষ করব বলে—মাসীমা হাঁপাতে হাঁপাতে নীচেয় নেমে এলেন।

ওরে খোকা, ভারি মুশকিল হয়েচে রে। মেয়েটার খুব জ্বর হয়েছে। অজ্ঞান—অচৈতন্য। জিজ্ঞেস করলাম, কি কষ্ট হচ্ছে? তা মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে কি বললে—বুঝতে পারলাম না।

অঙ্গ শীতল করা সুসংবাদই বটে! কালই বলেছিলাম অসিত হতভাগাটাকে— পরের দায় ঘাড়ে নিয়ে ফ্যাসাদ না বাধে। তা এমন দুর্বিবপাক হবে কে ভাবতে পেরেছে? কলকাতায় ডাক্তার ডাকার সামর্থ্য আমাদের মত মধ্যবিত্তের থাকে না। শরীর খারাপের প্রথম দু'চারদিন—উপদেশ উপবাস--খাওয়া দাওয়ার বাছাবাছি--টোটকা —বড় জোর ঘরের হোমিওপ্যাথি পর্য্যন্ত চলে। তাতেও রোগ যদি বশ না মানে—ডাক্তার ডাকতেই হয়। রোগের জটিল অবস্থায় ডাক্তার যদি ইন্‌জেকশনের যন্ত্রপাতি শানাতে থাকেন- তাহলে আমাদের মত অত্যন্ত সুস্থ ব্যক্তিরও হৃৎপিণ্ড দ্রুত তালে লাফাতে

থাকে। অসহায় আতুরের মত আমরা আত্মসমর্পণ করি ডাক্তারের হাতে—অনেকটা 'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি-স্থিতেন' গোছের দার্শনিকতায় গদ্‌গদ্‌ হয়ে। তার পরে 'সমুদ্রে যার শয্যা—শিশিরে তার কিবা ভয়'—গোছ মরীয়া ভাব।

ডাক্তার ডাকতেই হল—দর্শনী ও ওষুধে বেশ কিছু বেরিয়ে গেল। আর শুশ্রূষা! মাসীমা বুড়ো মানুষ—কত আর করবেন? ওঁকে সামনে রেখে অন্তরাল থেকে আমিই সব করলাম। মাসীমাকে দিয়ে চেষ্টা করলাম যদি ওর কোন আত্মীয়ের নাম, ধাম কিংবা গ্রামের কোন হদিস্‌ মেলে! ভুল কথার মাঝে আসল কথাটি বার করা সহজ হল না। পাঁচ ছ'দিন কাটল এমনি করে।

ছুটি নিতে হল আপিস থেকে—সর্ব্বক্ষণ সাহচর্য্য দিতে হল রোগীকে। এ ক'দিনে আমার মধ্যে আবিষ্কার করলাম দু'টি মানুষকে। হিসাবী মানুষ আর সজ্জন মানুষ। হিসাবী মানুষ বলল, কেন এ দায় ঘাড়ে নিতে গেলে? মাসের মাঝামাঝি এই ঝঞ্ঝাট তোমায় কোথায় নিয়ে যাবে ভাবতে পার কি? যে তোমার কেউ নয় তার জন্য অর্থ ব্যয়—বোকামী ছাড়া আর কি! তুমি সদাগরী আপিসেব নিম্নতম কেরাণী—ক'বছরই বা চাকরীতে ঢুকেছ? দেশে তোমার বাবা আছে—মা আর ভাইবোনেরা আছে। মানি, কিছু ধানী জমি তোমাদের সম্বৎসরের খোরাকটা জুগিয়ে থাকে, কিন্তু খাজনাপত্র, দায় অদায়, উপনয়ন বারব্রত—ইস্কুল আদালত কোন্‌টাতে নগদ টাকার দরকার না হয়? তোমার উপার্জ্জনের মোটা একটা অংশ প্রতি মাসে তোমার বাবাকে পাঠাতে হয়—এখানের খরচ চালিয়ে কতই বা হাতে থাকে মজুত? মাসে তিনবার সিনেমা দেখা—কিংবা দুটো চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কেনা—এতেই তো টাকা তোমার ফুরিয়ে যায়। তারপর বন্ধু বান্ধবরা যদি রেষ্টুরেণ্টে দু'একদিন চা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে—তুমি চক্ষে দেখ অন্ধকার। অথচ সেই তুমি…

সজ্জন মানুষ হিসাবী মানুষকে ভ্রূকুটি করে। দেখ—সংসারে টাকা আনা পাইএর হিসাবটাই সব নয়। একজনের কষ্ট দূর করে মনে কি শুধু কষ্টই জমে—আনন্দের রেখাপাত হয় না? হিসাবকে ডিঙিয়ে চলা মানেই তো দেয়াল টপকে ময়দানে এসে পড়া। ঘরের ছাদ রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচায় বলেই সব সময়ে সুখকর নয়। আকাশের দাক্ষিণ্যও মনকে প্রসারিত করে মাঝে মাঝে। একের মাঝে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকা—আর বহুর মাঝে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়া—লাভক্ষতির পাল্লাটা কোনদিকে ঝুঁকে পড়ে?

মেয়েটির রোগতপ্ত মুখের পানে চেয়ে হিসাবনিকাশ ভুলে যাই। মনে হয়—ঝড়ের ঝাপটায় আহত হয়ে ভীরু একটি পাখী লুটিয়ে পড়েছে আমার দয়া-দাক্ষিণ্যের আশ্রয়তলে। ওর শ্যামল মুখখানিতে ক্লিষ্ট ছায়া ঘন হতে থাকে, সে ছায়া আমার বুকের মাঝখানে বাসা বাঁধে; ওই ছায়াটুকু মুছে নিতে না পারা পর্য্যন্ত পৃথিবীর যতকিছু উপচার আয়োজন সবই মনে হয় নিরর্থক।

ছ'দিন কেটে গেলে চোখ মেললো ও। ওর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল পৃথিবী। বস্তুর পরিচয়ে এবং বোধের আলোয় ও যেন জাগ্রত হয়ে উঠল।

আমি কোথায়? অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে ও পুনরায় চোখ বুজল।

পরের দিন বলল, আমায় কেন পাঠিয়ে দিলেন না দেশে? কতদিন এখানে আছি?

সুস্থ হলে অবশ্যই দেশে যাবেন আপনি। আশ্বাস দিলাম।

অসুখ! কি অসুখ হয়েছে?

কথা কবেন না—আপনি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

পথ্য করে বলল, এই তো সেরে উঠলাম—আজই পাঠিয়ে দিন দেশে।

দেব। আপিস থেকে এসে ব্যবস্থা করব। এই কাগজখানা রইল দুপুরবেলা পড়বেন। বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

অসিতের সঙ্গে এই নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা হয়। আজও বললাম সব কথা।

অসিত বলল, ওঁকে বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়াই উচিত। ঠিকানাটা জেনে নাও, আমিও না হয় সঙ্গে যাব। অনেকদিন তো শহরে পড়ে পড়ে ইট কাঠ দেখছি…এ outing মন্দ লাগবে না।

স্থির হল আমরা দু'জনে ওঁকে পৌঁছে দেব দেশে।

ছুটির পর বাড়ী আসতেই মাসীমা বললেন, হাঁরে, আপিস যাবার সময় তুই শোভাকে কিছু বলেছিলি নাকি? ওতো সারাদিন মুখ ভার করে রয়েছে, ভালো করে খেলে না পর্য্যন্ত।

বলা বাহুল্য—অসুখের সময় আমার ঘরখানি ছেড়ে দিয়েছিলাম রোগীর জন্য। পথ্য পেয়েই ও চলে গেছে তিনতলায়—মাসীমার কাছে। এজন্য মাসীমা প্রকাশ্যে কিছু বলেন নি বটে, মনটা ওঁর খুঁত খুঁত করে বুঝতে পারি। হাজার হোক—ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা—থাকেন শুদ্ধাচারে পূজাপাঠ নিয়ে। কোথাকার পরিচয়হীন মেয়ে—তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা ছোঁয়া-মেশা করবে—এটা তিনি পছন্দ করেন না। একদিন মুখে বলেও ছিলেন, ওকে দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর বাবা, আমার যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব যেতে বসেছে।

শোভা অবশ্য সর্ব্বক্ষণ তিনতলায় থাকে না। আমি আপিস চলে গেলেই নেমে আসে দোতলায়। সারা দুপুরটি ওর কাটে আমার ঘরে। ঘরের আসবাব-পত্রের ধূলো ঝেড়ে—র‍্যাক আর টেবিলটা গুছিয়ে বইগুলি সাজিয়ে রাখে পরিপাটি করে। বিছানাটা কোন কোন দিন রোদে দেয়—বালিশের ওয়াড় ময়লা হলে সাবান ঘসে—মেঝে ঝাঁট দিয়ে তকতকে করে রাখে। শরীর দুর্ব্বল হলেও—যথাসাধ্য ও ঘরখানির পরিচর্য্যা করে। চার-পাঁচ দিন ধরে তাই

লক্ষ্য করছি। ভালই লাগছে। সেবার সুকোমল স্পর্শ মনকে প্রসন্ন করে তুলছে। অথচ আমার সামনে আসবার আগ্রহ ওর তেমনি দেখি না। সেবা দিয়ে মন জয় করতে চায়—শোভা হয়তো তেমন মেয়ে নয়; ও-সব যেন ওর সহজাত কর্ম্মশক্তির গুণেই ঘটছে।

মাসীমার সঙ্গে তিনতলায় গেলাম। দেখলাম—ছাদের আলসেয় দু'খানা হাত রেখে ও দাঁড়িয়ে আছে আকাশ পানে চেয়ে। দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে—ছায়ায়-আলোয় মেঘের মধ্যে চলেছে আলপনা দেওয়া। একটা পাহাড় উঠছে জেগে, যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলি সূর্য্যকিরণ-রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তার পাশে একটা দৈত্যের আকৃতি—এক চূড়া থেকে অন্য চূড়ায় প্রসারিত ওর দেহ—সামনে ত্রিশূলের আকারে তিন টুকরো মেঘ ক্রমশঃ বাড়ছে। শিব-ভক্ত দৈত্য যেন প্রণাম করছে দেবাদিদেবকে। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার মুহূর্ত্তে মেঘের গায়ে বর্ণে ও রেখায় কত যে বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে! রামায়ণ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতির কাহিনী থেকে বুঝি সেগুলি বেছে বেছে নেওয়া। বিশ্বশিল্পী এগুলিতে ক্ষণকালের জন্য রূপারোপ করেন—যাঁর মনের সঙ্গে যোগস্থাপন করে এই চিত্র-সম্পদ—তাঁর লাভটিকে খুঁটিয়ে দেখানো শক্ত। এ যেন—অলস মনের অজানা কত ছবি। মনে হয় ওর ঃ

'ছন্দ বুকে যতই বাজে—ততই সেই মূরতি মাঝে,
জানি না কেন—আমারে আমি লভি।'

শোভা কি ওই ছবির মধ্যে নিজেকে লাভ করে তন্ময় হয়ে গেছে?

গলার শব্দ করে ওর ধ্যান ভঙ্গ করলাম। বললাম, শুনলাম—আপনি আজ কিছুই খাননি—শরীর কি খারাপ হয়েছে ফের?

না—ভালই আছি। ও জবাব দিল।

তবে খেলেন না কেন?

ভাল লাগল না। অন্যদিকে চেয়ে ও উত্তর দিল।

এ-বিষয় নিয়ে আব কি কথা কাটাকাটি করতে পারি! একটু চুপ করে থেকে বললাম, আমরা ঠিক কবেছি—আপনাকে দেশে পৌঁছে দেব। কবে আপনার সুবিধা হবে জানাবেন। আর ঠিকানাটা যদি জানান তো একখানা চিঠি লিখে খবর নিতে পারি।

না—না। মুখ ফিরিয়ে ও আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল। অপরাহ্ণের মেদুর আলোয় স্পষ্ট দেখলাম—ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যে ঘরে যাবার জন্য এতদিন আকুল আগ্রহে দিন গুনছিল—তারই প্রসঙ্গে ওর এত আতঙ্ক কেন?

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, তাহলে খবব না দিয়েই দেশে যাবেন?

কোন উত্তর না দিয়ে শোভা নতমুখে আলসের পানে চেয়ে রইল। আকাশের গায়ে বর্ণলেখা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এল, এক সারি সাদা বক মালার মত দুলতে দুলতে আকাশেব কোন্ প্রান্তে মিলিয়ে গেল। কাঞ্চনজঙ্ঘা মিলিয়ে কালো শ্লেটের মত মেঘ ছড়িয়ে পড়লো দিকপ্রান্তে। শূন্য থেকে চোখ ফিরিয়ে শোভার পানে চাইলাম। ও তখনও নিরুত্তরে আলসের পানে চেয়ে আছে।

কাটল আরও কিছুক্ষণ। অবশেষে মুখ তুলল শোভা। আবছা অন্ধকারে সে মুখের ভাষা পাঠ করা যায় না—প্রতীক্ষা করতে লাগলাম ওর উত্তরের।

শোভা মৃদুস্বরে বলল, আর যদি আমি দেশে ফিরে যেতে না চাই?

এ প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

শোভা বলল, ভার-বোঝা হয়ে হয়তো আপনার অসুবিধা ঘটাচ্ছি, কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়া আমার চলবে কিনা ঠিক বুঝতেও পারছি না।

কেন চলবে না? মূঢ়ের মত প্রশ্ন করলাম।

সেই কথাই তো ও-বেলা থেকে ভাবছি। মনে মনে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর পাইনি সঠিক। আপনারা—পুরুষরা যা পারেন—আমরা তা পারি না। এক যুগ নিরুদ্দেশ থেকে ফিরে এলে সংসার আপনাদের আদর করে নেয়, আমরা একবেলা বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকলে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটে।

সে ছিল এককালে—যখন সামাজিক শাসনের মূল্য দিত লোকে।

আজও সে মূল্য দিই না কি আমরা? সেই কারণেই বাড়ী ফিরতে ভয় হয়। আমার জন্য আর কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হতে পারে কি? যাতে সম্মানের সঙ্গে বাস কবতে পারি—

এখানে আপনাকে কেউ অসম্মান করেছে কি? মাসীমা কিংবা আমি—আমাদের ব্যবহার—

না—না—একি কথা বলছেন! আপনাদের কাছে আমার অনেক ঋণ, তা শোধ হবার নয়। ও অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বললাম, তাহলে আমাদের ব্যবস্থায় আপত্তি করবেন না। ভাল মত খোঁজখবর নিয়ে তবে আপনাকে—

না—সে চেষ্টা আপাততঃ ছাড়ুন। একদিন হয়তো ওখানে যেতেই হবে—তবে আজ ও-কথা থাক। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, খানিক ভাবতে দিন আমাকে। ওর কণ্ঠে কান্নার আভাস।

তাড়াতাড়ি বললাম, বেশ—ভাল করে ভেবেই উত্তর দেবেন।

ছাদ থেকে নেমে এলাম। নেমে এলাম হাল্কা মন নিয়ে। মাথার ওপর থেকে বোঝা নামল না,—তবু হিসাবী মানুষ ক্ষুণ্ন হল না একটুও। হয়তো এই ভেবে তৃপ্তি লাভ করলাম—আমার সামান্য ত্যাগের দ্বারা একটি জীবনে কিছু শান্তি আসে তো—আসুক।

মেয়েটির মনের মেঘ শরৎকালের মত লঘু নয়। যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে ওর সমস্যা সমাধান করা যাবে না।

রাতের আহারাদি সেরে কাগজখানা নিয়ে বসলাম। কাগজ উল্টাতে গিয়ে দেখি—শিরোনামা সমেত চতুর্থ পৃষ্ঠার এক কলাম লেখা কে কেটে নিয়েছে। শোভা নিয়েছে কি? ওই পৃষ্ঠায় কি এমন .জরুরি সংবাদ ছিল—যা কেটে নেয়ার প্রয়োজন হল? এ নিশ্চয় পাশের ঘরের ভাড়াটে অমরেশবাবুর বড় ছেলে মণীশের কাজ। ম্যাট্রিক দিয়ে বেকার ছেলেটা কাগজে কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁজে বেড়ায়। আরও বহুবার আমার অজান্তে কাগজের অংশ এ ভাবে অন্তর্হিত হয়েছে।

কাগজ পড়ছি একমনে, মাসীমা ঢুকলেন সাড়া দিয়ে। বললেন, একটা কথা বলতে এলাম তোকে। শুনলাম--শোভা নাকি বাড়ী ফিরতে চায় না?

আমাকে মাথা নাড়তে দেখে বললেন, এতো ভাল কথা নয়। সোমত্ত কুমারী মেয়ে—ও কেন অজানা মানুষেব কাছে পড়ে থাকবে? ওর পরিচয় আমরা জানি না—স্বভাব চরিত্র জানি না—

বললাম, এ ক'দিন একত্র থেকেও ওর স্বভাব চরিত্র কি পরিচয় জানি না বললে ভুল বলা হবে মাসীমা। ও দেশে ফিরতে চাইছে না তার একটি মাত্র কারণই আমি দেখছি।

কি কারণ?

ও দুর্নামের ভয় করছে।

এখানেই কি দুর্নামের কিছু বাকী আছে ভাবিস? সবাই জিজ্ঞেস করছে—ও কে? কোথায় ছিল এতদিন? আমাদের সঙ্গে সুবাদ কি? কত দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বিয়ে হয়েছে কি? কাউকে ভালবেসে ঘর থেকে পালিয়ে আসে নি তো?

এসব বাজে কথার উত্তর দেওয়ার দরকার কি? বললাম।

তোদের কাছে বাজে হতে পারে—আমাদের কাছে নয়। পাঁচজনকে নিয়েই সংসার, পাঁচজনের নিন্দা সুখ্যাতি ভালমন্দ সুখদুঃখ এর খবর যদি না রাখতে পারি তো বনে বাস করলেই তো হয়।

হেসে ফেললাম ওঁর কথায়।

মাসীমা বললেন, যা ব্যবস্থা করবে শীগ্‌গির করো বাপু। আমারও মানসম্ভ্রম আছে, পাঁচজনের কানাকানি মুখ বাঁকানি কেন সইব! ভাল কথা, মণ্টুর মাসী দু'মাসের জন্যে কাশী যাচ্ছেন। ভাল লাগলে সেখানেই থেকে যাবেন হয়তো। তা ওঁর ঘরটা যদি শোভার থাকবার জন্য ব্যবস্থা করা যায়—

বেশ তো—তাই কর। ভাড়া আমিই দেব।

ভাড়ার কথা ভেবে তো আমার চোখে ঘুম নেই! মেয়েটা ভাল ভাবে থাকুক—একটা সুরাহা হোক, তা হলেই যথেষ্ট। মাসীমা চলে গেলেন।

কাগজ পড়া হল না—মাসীমার কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম শোভার কথা। ধরা যাক, পিতৃগৃহে ওর স্থান হ'ল না, ও এখানেই রয়ে গেল। ওকে সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করবার কি ব্যবস্থা করে দিতে পারি আমি? অনেক কষ্টে চাকরির ভেলায় চেপেছি। সবে সুরু হয়েছে যাত্রা, বহুদূরে তীরভূমি। এখানে যে নিরাপদে পৌঁছাবই তার নিশ্চয়তা কি? যুদ্ধোত্তর পৃথিবী এমনই কঠিন যে স্নেহ মায়া ভালবাসার অঙ্কুরগুলি স্বভাবে বিকশিত হতে পারছে না। বস্তু মূল্যে বিকিয়ে যাচ্ছে ভাবের ফসল। সৌন্দর্য্যবোধে আজ জীবনের মহিমা নয়; দেবঋণ ঋষিঋণ এসব কথা শাস্ত্রে আছে—পিতৃঋণও স্বীকার করার অবসর নাই। তাবলে ঋণের জের মেটেনি—নিজেকে জড়িয়ে ফেলছি অক্টোপাশের আলিঙ্গনে। নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে পারি না—অন্যকে বিধি দেখাব কোন্ সাহসে?

শহরে. সমাজ নাই, এ বাড়ীতে তার আলোড়ন আছে। তবু শোভার সম্পূর্ণ পবিচয় তারা জানে না। নাই জানুক, আত্মীয়তার কঠিন সূতোও তরুণ-তরুণীর একত্র বাসে যে অপলকা হবে এতো নিশ্চিত। শোভাকে রক্ষা করতে গিয়ে ব্যথা না দিই!

ঘরের আলোটা বেশ উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে। বাল্‌বের পুরু ধূলোর আস্তরণ কে সাফ্‌ করে দিয়েছে। নীচের টিপয়ের ঢাকনাটা ধপ্‌ধপ করছে। আড়ার কোলে ঝুল নেই—মেঝেয় নেই ছেঁড়া কাগজের টুকরো। টান টান করে পাতা চাদরে গা এলিয়ে ভাবছি এ ঘরে এই প্রীতির বেসাতি কে বসাল? ঘর যেন দেউল হয়েছে—চারটি দেয়াল ভেঙ্গে চুবে কে যেন আকাশের বিস্তার দিয়ে গড়েছে একে। এর মধ্যে বস্তু-পীড়িত মনকে অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারি। আকাশের গায়ে যেমন ধোঁয়া লাগে না—এই ঘবে ছড়ানো মনেও তেমনি তাপ লাগবে না।

শোভা থাকুক না এখানে। এক মাস ত্ব'মাসের জন্য নয়—অনেক মাস ধরেই থাকুক। আমাব কাছে ঋণেব ভাবে আনত হয়ে—আমার মনকে অভিষিক্ত করুক প্রীতিতে। বাসা আর কর্ম্মক্ষেত্রের দূরত্ব লুপ্ত হোক—দীর্ঘ নীরস পথ আর কর্ম্মভবন সুরভিত হয়ে উঠুক—এই পরম প্রাপ্তির সৌরভে।

অসিতকে বললাম সব কথা। অবশ্য মনেব কথা বাদ দিয়ে।

অসিত বিস্মিত হল, চিন্তিত হল। বলল, তাইত, তোব জন্য যে ভাবনা হচ্ছে!

আমাব জন্য ভাববার লোকের অভাব কি। সে জন্য তো অভিভাবকরা রয়েছেন।

ঠিক কথা। অসিত হেসে উঠল। তা তাদের নির্ভাবনা করছ কবে?

দাঁড়া—আগে বসিই স্থির হয়ে। সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, এখানে—

ইস্—কতই যেন ভূয়োদর্শন হয়েছে। কত বয়স রে তোর?

তা সিকি শতাব্দীতে পৌঁছব পৌঁছব করছি। হেসে বললাম।

তাহলে আর কালবিলম্ব নয়—অভিভাবকদের নিশ্চিন্ত করবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

নিজের পানে চেয়ে দেখেছিস?

আমার তো ন মাতঃ ন পিতঃ ন বন্ধু ন ভ্রাতঃ—

অসিতের পরিহাসের সুরটা ভারী হয়ে উঠল। আমারই মনে ভারী হল সুরটা। বললাম, তোরই তো উচিত. সংসারে আশ্রয় বাঁধা।

পরের কথা পরে—আগের কথা কও তো। শোভা কি তোমার ঘরের শোভা হয়েই থাকবেন?

বুকটা ছাঁৎ করে উঠল ওর পরিহাসে। লঘুভাবে নিতে পারলাম না কথাটা। বললাম, ছিঃ—যে মেয়ে বিপদে পড়েছে তাকে নিয়ে ও ভাবে ঠাট্টা তামাসা করা অভদ্রতা।

আমার গম্ভীর স্বরে অসিতও বিস্মিত হল। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের পানে। কি কঠিন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ওর! মুখ ফিরিয়ে নিলাম। হঠাৎ লজ্জিত হলাম।

অসিত বলল, আচ্ছা ব্রাদার—দেখা যাক।

কি দেখা যাবে? শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

কিছু না। একটু হেসে বলল, মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু বেশীক্ষণ থাকে না, সব ঋতুতে দেখা যায় না। কিন্তু সকাল বেলা পূবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য্য ওঠে রোজ।

তোর হেঁয়ালি রাখ।

একদিন এ হেঁয়ালির সমাধান হবে। তবে ক্রস্ওয়ার্ড পাজ্‌লের মত মোটা পুরস্কারের প্রত্যাশা আমি রাখি না। অসিত হাসতে হাসতেই এ প্রসঙ্গ শেষ করল।

আপিসে সারাক্ষণ ধরে ওর কথাটাই মনে মনে যাচাই করতে লাগলাম। 'মনে কি মোহ সঞ্চার হয়েছে—? শোভাকে ভাল লাগছে বলেই কি ওর যাওয়া হল না বলে—হিসাবী মানুষটা কোথায় যেন পালিয়ে গেল! অনেক দিনের হিসাব—এক মুহূর্ত্তের হিসাবে গরমিল হল।

এখানে মনের কথা একটু খুলে বলি। আমার মত যুবকরা প্রেম ভালবাসার কল্পনায় মশগুল হয়ে না থাকুক,—সে অবকাশ তো অধিকাংশেরই থাকে না, তবু তাদের কল্পনায় কখনও কোন বর্ষাকালেব অপরাহ্ণে রিমঝিম বৃষ্টিধারার মধ্যে অস্তগামী দিননাথ তাঁব রশ্মিজালের তুলি বুলিয়ে রচনা করেন না কি সপ্তরঙেব রামধনু? ক্ষণকালীন সেই সম্পদ মানসলোকে একবার প্রতিষ্ঠিত হলে কিছুতেই অপচিত হতে চায় না। অর্থনৈতিক চাপে জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে আমরা দমন করে রাখি—জীবনের পাত্রে তারা উচ্ছ্বসিত হয় মাঝে মাঝে। কে যেন কোথায় বলেছেন: সৃষ্টির আদিতে ছিল একটি প্রাণী—হয়তো সে পুরুষই। কিন্তু তাব মনে ছিল না আনন্দ। একদিন নিজের পঞ্জরাস্থি খসিয়ে সে সৃষ্টি করল নারীকে। অমনি সৃষ্টির আনন্দ তাকে অধীর করে তুলল। সেই আদিযুগের পঞ্জরাস্থি-খসানো পুরুষ সন্ধান করে ফিরছে তার সঙ্গিনীকে। মর্ত্ত্যভূমে অগুন্তি মানুষেব মেলা। এই অগুন্তি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে যুগল আত্মা—একের পঞ্জরাস্থি নিয়ে অন্যের সত্তা। এই বিচ্ছিন্ন দেহাংশের মধ্যে যে মিলন-কামনা জাগ্রত রয়েছে—তাই নরনারীর মনে বাসনা কিংবা প্রেম যাই বলা হোক—তাকে আশ্রয় করে সার্থক হতে চাইছে। এরই নাম বিবাহ, মিলন অথবা ভালবাসার আকর্ষণ। আমাদের মত যুবার মনও খোঁজে সেই আধখানা দেহ-দিয়ে-গড়া সঙ্গিনীকে। দেহের মিলন-ক্ষুধা না থাকলে সৃষ্টিতে কল্পনা থাকত না—আনন্দ থাকত না—পৃথিবীর রূপরস সৌন্দর্য্যের কোন সার্থকতাই থাকত না। একটি পুরুষ ভালবাসল

একটি নারীকে, কিংবা দু'জনে পরস্পরকে ভালবেসে সার্থক হতে চাইল —এইটিই সৃষ্টির মূলতত্ত্বের ব্যাপার। এই মূলতত্ত্বকে এড়িয়ে যাবে সৃষ্টির মধ্যে এমন কে আছে সৃষ্টিছাড়া? আমি তো সৃষ্টিছাড়া নই— নারী-সঙ্গ কামনা আমার মনে নানান বর্ণের ছবি আঁকতে সুরু করে একটু অবসর পেলেই।

বাবা দু'খানা চিঠি লিখেছেন ইতিপূর্ব্বে। চাকরিতে বহাল্ হয়েছি —উপার্জ্জন করছি, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করব এমন সঙ্কল্প প্রকাশ করিনি —তবে কেন তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করছি না? সংসার কি এমন কঠিন বস্তু—তার সংস্পর্শে এলে জীবনের আশা আনন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে? আর ভারি তো আশা আনন্দ মধ্যবিত্তের! খাওয়া পরার কৃচ্ছ্র তা থাকবে না, মাথার উপর থাকবে একটি আচ্ছাদন, সংসারে থাকবে প্রীতি আনন্দ, এই হলেই তো যথেষ্ট। এর উপর সোনার স্তূপ নাই যদি সঞ্চিত হল—নাইবা থাকল একটি মোটর, দাসদাসী আড়ম্বর সমারোহ—এ সবের স্বপ্ন আমরা নাই বা দেখলাম। এই সামান্য উপকরণে জীবন আমাদের নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না! তা যদি না হয় তো বিবাহে অনিচ্ছা কেন?

দু'খানা চিঠির জবাবে লিখেছি– এখন নয়, আর কিছুদিন যাক।

কেন লিখলাম ওকথা? যদি অন্তর অনুসন্ধান করি তাহলে বুঝব সঙ্গিনীলাভে অনাগ্রহ এর কারণ নয়। জীবনযুদ্ধে জয়পরাজয়ের অনিশ্চয়তা কিছুটা—এবং অর্থের দ্বারা বিবাহিত জীবনে সুখকে যে ভাবে আয়ত্ত্ব করা সম্ভব—তা হয়তো আমার ভাগ্যে ঘঠবে না এই শঙ্কাও খানিকটা,—এই দুইয়ে মিলে আমার অনিচ্ছা।

কল্পনা কি করি না একটি কূজন-লীলা-প্রমত্ত নিশীথ রাত্রির? কল্পনা করি না কি তন্দ্রাহীন চোখে—এগিয়ে যাচ্ছে প্রহরগুলি—মনের উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে অশ্রান্ত আলাপধারা—উষ্ণ দেহ-সান্নিধ্যে জগৎ মুছে যাচ্ছে সময়ের স্রোতে? আমার অর্দ্ধেক দেহকে অপর

অর্দ্ধদেহের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে ডুবে যাচ্ছি আনন্দের সমুদ্রে? এই কল্পনা প্রত্যহই করি—বিশেষ করে রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত—এমনি একটি মধুর কল্পনা মাঝে মাঝে আমায় উতল করে তোলে।

তবু ভয় করি বাস্তবকে—সন্দেহ করি নিজের শক্তিকে।

বাবা লিখেছেন এবার ঃ

তোমার কোন কথা আর শুনব না। বিবাহ এমন ভয়ঙ্কর জিনিস নয় যে তোমাকে দুঃখের মধ্যে টেনে নামাবে। তুমি চাকরি করছ—জমিব অন্নে সম্বৎসরের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। তা ছাড়া—তোমার মা দিন দিন অপটু হয়ে পড়ছেন, তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। তুমি জ্যেষ্ঠ এবং উপার্জ্জনক্ষম না হলে এ অনুরোধ কবতাম না।

এরপব লিখেছেন মা—ওই পত্রের একাংশে ঃ মেয়েটিকে আমি দেখেছি। রূপে গুণে এর তুলনা নাই। এমন সুশীলা নরম মেয়ে আমার চোখে তো আজ অবধি পড়েনি। এ মেয়ে ঘরে এলে আমরা সুখী হব।

সেই অজানা মেয়েকে ভাবতে গিয়ে দেখি—শোভা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। অবশ্য মনেরই সামনে।

শোভা হাসছে মৃদু—যদিও এখানে এসে অবধি ওর মুখে হাসি দেখিনি আমি। হাসলে ওকে চমৎকার দেখায়, ওর দেহের ভঙ্গিমায় যে লীলাতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে···কিন্তু সত্যিই কি ও হাসবে না? ও কি সহজ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে না এ পরিবেশে?

ঘুমোবার আগে চিঠি লিখলাম বাবাকে, পত্রের একাংশে মাকেও। লিখলাম ঃ—বিয়েব কথা এখন তুলবেন না—সামনে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা। তাঁবা যদি অপেক্ষা করেন, ভালই। না করেন—পরীক্ষা শেষ হলে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করব।

বাবা লিখলেন ঃ তাই হবে। আনন্দের ব্যাপারে চাপ দেওয়াটা আমি পছন্দ করি না, মন দিয়ে পড়াশোনা কর।

জানি আমার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, কিন্তু এ ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় তো দেখতে পেলাম না।

এমনি করে কাটল একটা মাস।

সেদিন আপিস থেকে এসে নিত্য অভ্যাসমত হাত পা ধুয়ে বিছানায় শুয়ে কাগজখানা মেলে ধরেছি—হঠাৎ টিপয়ের উপর ঠক করে একটা শব্দ হল। কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি—শোভা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। ওর পরনে একখানি কমদামী রঙীন শাড়ী। মিলের শাড়ী। গায়ে একটি ছিটের ব্লাউস। হাতে দু'গাছি করে প্লেন চুড়ি—কানে ছোট দুল। চুলে একটা এলো খোঁপা বাঁধা। গামছা দিয়ে মুখের তেল আর ঘাম মুছে এসেছে—রংটি মনে হচ্ছে উজ্জ্বলতর। এই একমাসে ও স্বাস্থ্য সঞ্চয় করেছে, একটু ফর্সাও হয়েছে। টিপয়ের উপর চা ও প্লেটে কিছু খাবার।

বললাম, এসব কেন? বিকেলে আমি তো বাড়ীতে চা জলখাবার খাই না—ওগুলো বাইরে থেকে সেরে আসি।

তা হোক—খেয়ে নিন। মৃদুস্বরে অনুরোধ করল শোভা।

চা কি আপনি তৈরী করলেন?

ঘাড় কাত করে শোভা স্বীকার করল।

কিন্তু কষ্ট করে কেন করলেন এসব?

জানি না। কষ্ট হয়নি বলেই হয়তো করেছি। সত্যি কি খাবেন না? ওর কণ্ঠস্বর ক্লিষ্ট বোধ হল।

তাড়াতাড়ি প্লেট টেনে নিয়ে বললাম, চা এমনই জিনিস—একবার খেয়েছি বলে আর খাব না—এমন প্রতিজ্ঞা চলে না।

মুখ নীচু করে ও যেন হাসল মনে হল।

প্রসন্ন হয়ে উঠল চিত্ত। আস্তে আস্তে চা পান করতে লাগলাম।

চা এবং খাবাব দুই-ই শেষ হলে শোভা বলল, একটা কথা বলব যদি—

বেশ তো বলুন না?

কাগজে প্রায়ই পড়ি—পোষ্ট বক্সেব ঠিকানায় পত্র দিন। ওটা কি জিনিস?

যিনি বিজ্ঞাপন দেন—তাঁব ইচ্ছা আত্মগোপন কবা। ওই বক্সেব ঠিকানায় চিঠি এলে খোদ মালিকেব হাতেই পৌঁছয়।

ও বকম কবে পত্র দিতে কি খবচ পড়ে?

খবচ পড়ে বৈকি—জানি না ঠিক কত পড়ে।

শোভা খানিকক্ষণ চুপ কবে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল—তাবপব প্লেট-কাপ গুছিয়ে নিয়ে ঘব থেকে বাব হয়ে গেল।

হঠাৎ পোষ্টবক্সেব কথা জিজ্ঞাসা কবল কেন শোভা? ও কি আত্মগোপন কবে কোন সংবাদ নিতে চায়? বাড়ীব জন্য নিশ্চয় ওব মন ব্যাকুল হয়েছে।

আশ্চর্য্য—এতদিনেও ওব পূর্ণ পবিচয় পেলাম না! পবিচয জিজ্ঞাসা কবলে পাছে ব্যথা পায়, পাছে অভদ্র মনে কবে—সেইজন্য এ সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল দমন কবেছি। কিন্তু মাসীমাব কৌতূহল মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে। সেদিন বললাম মাসীমাকে, নাই বা জানলে জাতেব খবব? বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে—এই যথেষ্ট। ওব জাতেব সংবাদ পেলে আমাদের দয়া কি বেশী হবে?

মাসীমা বললেন, সব কথাবই উল্টো মানে কবিস কেন! আমি ব্রাহ্মণেব ঘবেব বিধবা—আমাবও—

বললাম, ওকি সর্ব্বদাই তোমায় ছোঁয়া-নেপা করে বেড়াচ্ছে?

মোটেই না—সেই জন্যেই তো সন্দেহ হয় মেয়েটা স্বজাতি নয়।

যেদিকে ভাঁড়ার আছে—সেদিকে মোটেই পা বাড়ায় না, কাপড়ের আলনার কাছে ভুলেও যায় না, বিছানা থেকে তিন হাত দূরে বসে। সেদিন আমার শরীরটা খারাপ হয়েছিল—বললাম, তোমাদের দু'জনের মত রান্না কর মা—তা কিছুতেই উনুন-ধারে গেল না। মেয়েটির আচার আচরণ ভাল, কিন্তু ও যাদের কাছে এতদিন রয়েছে—তাদের সব খোলসা করে না বলাটা কি• উচিত হচ্ছে ?

সন্দেহ আমার মনেও হয়েছে—ও হয়তো স্বজাতি নয়। কিম্বা অন্য কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সেজন্য আমরাই বা কি করতে পারি।

আজ চা খাওয়া হয়ে গেলে সেদিনের কথাগুলি মনে পড়ল। যে মেয়ে এতটা ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে সে হঠাৎ চা জলখাবার তৈরী করে আনল কোন্ সাহসে ?

একটু পরে মাসীমা নীচেয় এসে সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। বললেন, শোভা ক'দিন থেকেই বলছিল—মাসীমা, আপনার ভাইপো কেন বাজারের খাবার চা খেয়ে আসেন—বাড়ীতে কি ওগুলো তৈরী করা যায় না ? বলেছিলাম হেসেই, আমি বুড়ো মানুষ, পেরে উঠিনা অত। তা তুমি তো হেঁসেল-ধারে যাবে না—না হলে—

বললে, আমায় যদি বিশ্বাস করেন তো এ ভার নিতে পারি।

বিশ্বাস না-ই করব যদি তো বাড়ীতে জায়গা দিয়েছি কেন ? বললাম।

বলল ও, আপনাদের দয়ায় মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছি—মান সম্মান নিয়ে বাস করতে পারছি। কিন্তু আপনাদের সত্যিকার পরিচয় দিতে পারছি না—এতে কষ্টও কম পাচ্ছি না মাসীমা। বলতে বলতে ও কেঁদে ফেলল।

ওকে কত করে বোঝাই—তবে কান্না থামে। কান্না সামলে বলল,

এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—যাতে দেশে যাবার সাহস হচ্ছে না। তবে এটুকু বিশ্বাস করুন—কোন খারাপ কাজ করে বাড়ী থেকে পালাই নি আমি। কোন নীচ জাতের মেয়েও নই। আমরা কায়স্থ বলে আপনার জিনিস-পত্তর নাড়া-চাড়া করতে সাহস করি না।

বললাম, তা রান্নার কাজটা নাই-বা করলে। আমি বিধবা মানুষ—শুদ্ধাচারে থাকি—মন্ত্র নিয়েছি। জাতের কথা ছেড়েই দিই—নিকট আত্মীয় হলেও—তার যদি মন্তর না হয়—হাতের জল শুদ্ধ না হয় তো, তার হাতের রান্না খেতে পারব না। কিন্তু চা জলখাবারটা তোমাদের দু'জনের জন্য অনায়াসে করতে পার।

আপনার উনুনে কেমন করে করব ?

কেন গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলেই তো উনুন শুদ্ধ হল। তা'ছাড়া আগুন তো সব সময়েই শুদ্ধ—ওতে বাধা নেই।

বললে, তা এক কাজ করি না কেন মাসীমা, ছাদে তো অনেক ইঁট রয়েছে, খানকতক পেতে একটা উনুন করি—ওতেই দিব্যি চা জল-খাবার হয়ে যাবে। সেই ব্যবস্থা করেই আজ চা জলখাবার তৈরি করল। ভারি আচার বিচার মেয়েটির।

কিছুদিন আগে মাসীমা আপত্তি তুলেছিলেন—শোভার এখানে থাকা সম্বন্ধে। এত অল্পদিনে ওঁর সে আপত্তি খণ্ডন করল কে ? শোভার সেবা ও শান্ত ব্যবহার ?

ক্রমে অস্থায়ী উনুনে দুই একখানা তরকারিও রাঁধতে লাগল শোভা। আহার্য্যের স্বাদ বদলে গেল।

ভাদ্রমাসে মাসীমা বললেন, ওরে, একদিন কালীঘাটে নিয়ে চল আমাদের, ভাদ্রকালী দেখে আসি।

তুমি তো একাও যেতে পার মাসীমা—এই তো কাছেই।

না-রে—আজকালকার যে পথ-ঘাট শহরের, ভরসা হয় না। আর

কি আগেকার দিন আছে যে ডাঙ্গা-ডহর করে বেড়াবো! কাল রবিবার আছে—কাল নিয়ে যাবি তো?

যাত্রাকালে শোভা বলল, আপনারা ঘুরে আসুন—আমি বাড়ীতে থাকি।

বাড়ীতে তো অন্য লোক রয়েছে—কতক্ষণের পথই বা! নাও—তৈরী হয়ে নাও। মাসীমা বললেন।

না, আপনারা যান। শরীরটা ভাল নেই।

পথে এসে মাসীমা বললেন, শরীর ভাল নেই না—হাতী! আসলে ঠাকুর দেবতায় ওর ভক্তিছেদ্দা নেই। জানি—যখন আসল পরিচয় দিচ্ছে না...সারা পথ গজ গজ করতে করতে চললেন মাসীমা।

ফিরে এলেন মা-কালীর প্রসাদ নিয়ে। বললেন, কোথায় রে শোভা, পেসাদ নে মা-কালীর। মার কাছে মানত কর যেন তোর সব আপদ-বিপদ কেটে যায়—ভালয় ভালয় বাপ-মার কোলে ফিরে যেতে পারিস। আমিও মা-কালীর কাছে খালি তোর জন্যেই মানত করলাম। চিরটা কাল পরের ভাবনাতে মলাম। অধর্ম্মের ভোগ আর কাকে বলে!

প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে শোভা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেল। স্পষ্ট দেখলাম—ওর দু'চোখে জল টলটল করছে।

পূজো এল এর পরে। কলকাতার পূজো—জাঁকজমক এর যথেষ্ট। নাম-করা সব কারিগরেরা ঠাকুর তৈরী করে—পাল্লা দেওয়া চলে কার প্রতিমা কত ভাল উৎরে যায়। শুধু প্রতিমা তৈরীতে নয়, মণ্ডপ নির্ম্মাণ—আলোক-সজ্জা—প্রসাদ বিতরণ—বাজী - রোসনাই - বাজনার বাহুল্য—কোনটাতে না প্রতিযোগিতা! শক্তিশালী স্বর-বর্দ্ধক যন্ত্রে সঙ্গীত ও বক্তৃতা পরিবেশিত হয়—পাড়ায় পাড়ায় এমন কোলাহল কলরব ওঠে—

যা মানুষকে ঘরছাড়া তো করেই—পথ থেকে পথেও ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

মাসীমা বললেন, এবার উত্তর কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাব আমরা। কি বলিস শোভা?

শোভা বলল, অতদূর—

দূর নেকি—আমরা কি হেঁটে কলকাতা চষে বেড়াবো! ট্রাম রয়েছে—বাস রয়েছে কি করতে!

শোভা কোন উত্তর দিল না।

যাত্রার সময় শোভাকে পাওয়া গেল না। মাসীমা গজ গজ করতে করতে ছাদে উঠলেন।

দোতলা থেকে ওঁর গলা শোনা গেল: বলি তোর আক্কেলখানা কি! বছরকার দিন সবাই সেজেগুজে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্ছে—আর তুই কিনা…নে-নে বলছি শাড়ী বদলে। আজ যদি আমার কথা না রাখিস তো অনথ করব বলে রাখছি।

শাড়ী বদলে মাসীমার সঙ্গে নেমে এল শোভা। দোতলার আর দু'জন মেয়ে—সুধা ও ইলা সঙ্গী হল আমাদের—আর ওদের ভাই ফটিকও দলে ভিড়ল।

শোভার মুখে হাসি নেই—শহরের পথের দু'ধারে পণ্য-সজ্জায় যে বিস্ময়ঘোর দৃষ্টিতে ঘনায় তার চিহ্নমাত্র ওর চোখে নাই—পথ চলায় নেই উৎসাহ। ভিড়ের মধ্যে মিশে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল বার বার।

মাসীমা বললেনও এক সময়ে, আজকালকার মেয়ে তোরা, এমন আড়ষ্ট-আড়ষ্ট ভাব কেন রে! চেয়ে দেখ দু'ধারে—, কত বাজনা, গান, আলো, সাজানো, দেখ ভাল করে।

বাগবাজারের পূজামণ্ডপে মেয়েরা আলাদা হয়ে গেল—আমরা ঠাকুর দেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম গেটের কাছে। অপেক্ষা

করছি তো অপেক্ষাই করছি—কারও দেখা নেই। অবশেষে একজন স্বেচ্ছা-সেবককে বললাম সব কথা। সে বললে, আপিসে যান—নাম ধাম লিখিয়ে সন্ধান নিন—পাত্তা মিলবে।

আপিসে একজন টাক-পড়া আধ-বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক বললেন, ভবানীপুর থেকে আসছেন কি আপনারা? সঙ্গে একজন বৃদ্ধা আর তিন জন মেয়ে ছিলেন তো? ঠিক হয়েছে—ওরই মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আমাদের রেষ্ট ক্যাম্পে তাঁকে নিয়ে গিয়ে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই খানিকক্ষণ হল তাঁর জ্ঞান হয়েছে। ভারি দুর্ব্বল বলে তাঁকে ছাড়া হয়নি। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হলে—

শোভাই বটে। আমাকে দেখে বলল, এঁদের বলুন—আমি সুস্থ হয়েছি—হেঁটে যেতে পারব।

মাসীমা বললেন, রক্ষে কর বাবা—আর ঠাকুর দেখে কাজ নেই! এমন ভিড়ে মানুষ কখনও আসে। এখন ভালয় ভালয় ঘরে পৌঁছতে পারলে বাঁচি।

অনেক কষ্টে ঘরে ফিরলাম। ইলারা প্রতিমা—তার সাজসজ্জা—জাঁকজমক প্রভৃতির গল্প করতে করতে যে যার ঘরে চলে গেল—শোভাকে নিয়ে আমরা এলাম তিনতলাতে।

মাসীমা বললেন, কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড় শোভা।

শোভা বলল, ভাববেন না মাসীমা—আমি ভালই আছি।

কাপড় ছেড়ে মাসীমার জন্য জল গামছা এনে দিল—আলো জ্বালল, তারপর ঘর ঝাঁট দিয়ে লাগল।

মাসীমা বললেন, ধন্যি মেয়ে তুই—একদণ্ড বিশ্রাম নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

নীচের ঘরে এসে ভাবতে লাগলাম—সত্যই কি শোভা জনতার চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? বাড়ীতে এসে বিশ্রাম না নিয়ে এই যে

কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিল নিজেকে—এ কি শুধুই কর্ম্মপ্রেরণার বশে, না নিজেকে গোপন করার প্রয়াসে? ওর চোখে শহর এবং শহরের যাবতীয় বিস্ময়বহুল বস্তু কি এক নিমেষে শোভাশূন্য হয়ে গেল! কি এর রহস্য?

ভাবছি—শোভা চা নিয়ে ডাকল আমাকে, চা খেয়ে নিন।

চা! এত রাতে এর কি দরকার ছিল?

ঘুরে ঘুরে বড়ই ক্লান্ত হয়েছেন তো—তাই—

তুমি খেয়েছ? বলেই চমকে উঠলাম আপন মনে! আজ হঠাৎ অন্তরঙ্গ তুমি সম্বোধন বার হল মুখ থেকে!

শোভা ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল, চা তো আমি খাই না।

খাও না? কেন?

বাড়ীতে চায়ের পাট ছিল না তো। দাদা শুধু এর তার বাড়ী থেকে খেয়ে আসত।

চায়ে ক্লান্তি দূব হয় জানলে কি করে?

শুনেছি। বিজ্ঞাপনেও দেখেছি।

চা পান কবতে করতে বললাম, আচ্ছা—কোথাকার প্রতিমা সবচেয়ে ভালো লাগলো?

সবই তো ভাল প্রতিমা। চমৎকার ঠাকুর তৈরী করে এখানকার কুমোর। ওর কণ্ঠে উচ্ছ্বাস নাই।

বললাম, তোমাদের গাঁয়ে যে প্রতিমা হয়—

আমাদের গাঁয়ে কোন পূজো হয় না; পাশেব গাঁয়ে চৌধুরী-বাড়ীতে পূজো হয়। সে প্রতিমাও চমৎকাব।

ঠাকুরের প্রতিমা কোনটিই খারাপ হয় না, না খারাপ বলতে নেই? পরিহাসের লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

শোভা উত্তর না দিয়ে একবার মুখ তুলে চাইল আমার পানে। কি অসহায় করুণ সে চাহনি! নিরীহ নির্ব্বিরোধী মেয়ে—একে

পরিহাসের কথা মেরে চঞ্চল করার মত নিষ্ঠুর কাজ বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে প্লেট কাপ টিপয়ে রেখে দিলাম। ও প্লেট কাপ গুছিয়ে নিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে ডাকলাম, শোন। স্বরটি বোধ করি রূঢ় শোনাল ওর কানে। ও চমকে উঠল—কাপে ডিসে ঠোকাঠুকির ঠুন্ ঠুন্ শব্দ থেকে তা বুঝলাম। তবু কেমন যেন কথা-শোনানোর নেশা পেয়ে বসল আমায়। বললাম, তুমি যে বাড়ী হতে বার হতে চাও না—এটা আজ বুঝলাম। তুমি যে ভাল করে ঠাকুর দেখনি—তাও জানি। আর তোমার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া—

ঠন্ ঠন্ করে কেঁপে উঠল কাপ ডিস, কথা শেষ হবার আগেই ও এক রকম ছুটে পালাল। তীরবিদ্ধ হরিণীর মত ছুটে পালাল আমার সামনে থেকে।

কেন—কেন ও যখন তখন ছুটে পালায় এমন করে? সুদীর্ঘ ক'টি মাসে ওর লজ্জা সঙ্কোচ ভীরুতাকে ও জয় করতে পারল না? আমাদের গ্রহণ করতে পারল না আত্মীয় বলে—সুহৃদ বলে? ওর চারি ধারে দুর্ভেদ্য রহস্যজাল বিছিয়ে ও ক্রমশঃই যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু ও যে দূরে সরে যায় নি তার প্রমাণ পেলাম আর একদিন। পূজার পর দেওয়ালি গেছে—কালী পূজাতেও সার্ব্বজনীন উৎসব,—শহরের প্রমোদ-সূচীতে বড় বড় ঢেউ উঠেছে। পাল্লা দেওয়া চলেছে পূজার রাজসিকতায়। হিসাব মত এটা শরৎকাল, আকাশ উপরে উঠবে—আকাশ হবে ঘন নীল। হিসাব মত—নদীর চরে কাশের চামর দুলবে—বাড়ীর অঙ্গনে ফুটবে শিউলী ফুল—আকাশের কোলে ঝাঁক বেঁধে চলবে শ্বেত বলাকার পাঁতি। কিন্তু এবার শরৎকে ঢেকে এখনও চলছে বর্ষার মাতামাতি। আকাশ তারই দৌরাত্ম্যে নীচেয় আছে, পাটল রঙটিকে মুছে ফেলতে পারে নি।

সেদিন আপিস থেকে সবে বাড়ীতে পা দিয়েছি—হুড়মুড় করে বৃষ্টি এল নেমে। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের ঝাপটা। ঘরের দুয়োরটা ছিল ভেজানো—দুয়োবে ধাক্কা মেরে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

ঘরের ভিতরেও ততক্ষণ একটা প্রলয় ঘটে গেছে। চেয়াবটার ধাক্কা লেগে টিপয়টা পড়েছে উল্টে। একটা কাঁচের গ্লাস ছিল টিপয়েব উপর—সেটা ভেঙ্গে চুবমার হয়ে গেছে—ছিটকে পড়েছে কয়েকটী রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ওই গেলাসটাতে ফুলগুলি সাজানো ছিল হয়তো। সেই সঙ্গে ছিটকে পড়েছে রবীন্দ্র-নাথের চয়নিকাখানি। ঘবে একটি ধূপ জ্বলছিল—এতক্ষণে নিঃশেষ হয়েছে—তার গন্ধটুকু ঘবখানিতে ছেয়ে আছে। আর মাথাব উপর জ্বলছে নীল বাতিটা। সবচেয়ে বিপর্য্যস্ত দেখাচ্ছে শোভাকে—অনধিকাব প্রবেশের গ্লানিতে ও যেন মর্ম্মে মর্ম্মে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতপ্রায় দাঁড়িয়ে থেকে ও হেঁট হয়ে ভাঙ্গা গ্লাসেব টুকবোগুলি কুড়োতে লাগল। ও যেন কাজের বর্ম্মে নিজেকে আচ্ছাদন করে আত্মরক্ষাব উপায়টি বেছে নিয়েছে।

দুয়োব দিয়ে জলেব ছাট আসছিল ভেজিয়ে দিলাম দুয়োব। বাইবে প্রবল বর্ষণ সুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে। কি জানি কেন, এই সব-উলট-পালটকবা প্রকৃতি আমাব মনেতেও কবল প্রথম পদপাত।

ভিজে জামা কাপড় না ছেড়েই শোভাব পিছনে এসে দাঁড়ালাম। বৃষ্টিব আর্দ্রতা আব নূপুবধ্বনি আমাব অন্তবেব অন্তস্থল অভিষিক্ত কবে দিচ্ছে। আমাব সামনে অবনতমুখী বেদনাভাবগ্রস্তা মেয়েটি একটি একটি করে কুড়িয়ে তুলছে ভাঙ্গা কাঁচেব টুকবো। সারা জীবনে এ কাজেব বুঝি শেষ হবে না ওব। কাঁচের টুকরো জোড়া লাগে না—ও জানে, তবু সংগ্রহ কবে চলেছেই। এই নিবর্থক

পরিশ্রম করে ও নিজেকে অপব্যয় করবে—নিজেকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে ওর কুণ্ঠারও বুঝি শেষ হবে না।

চয়নিকার পাতা খোলা—একটি কবিতার কয়েকটি লাইন চোখে পড়ল। আশ্চর্য্য মিল—আজকের এই বৃষ্টিধারার সঙ্গে।

এমন দিনে তারে বলা যায়—
এমন ঘন ঘোর বরষায়।

আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলাম, শোভা।

কাঁচের টুকরো কুড়োতে কুড়োতে মুখ ফিরিয়ে চাইল শোভা। আমার চোখে তখন কি কামনার আগুন জ্বলেছিল—না হলে ও অমন করে চমকে উঠবে কেন? ওর হাত থেকে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলো খসে পড়বেই বা কেন? ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। আমার বুকের মাঝে ততক্ষণে বাইরের ঝড় এসে আশ্রয় নিয়েছে—নিশ্বাসে ঝরছে আগুন—থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ।

দুরন্ত মন—অবাধ্য মন—বল্গাচ্যুত অশ্বের মত ছুটে চলল পথ প্রান্তর ডিঙিয়ে। ডিঙিয়ে চললাম দুরারোহ পর্ব্বত—দুরতিক্রম্য নদী—ভয়াল অরণ্য। কণ্টক-আকীর্ণ উপলকণ্টকিত বন্ধুর পথে বাজছে অশান্ত অশ্বক্ষুরধ্বনি।···বায়ুর চেয়ে দ্রুতগামী কি? প্রশ্ন করেছিল বকরূপী যক্ষ ধর্ম্মরাজকে। মন। উত্তর দিয়েছিলেন ধর্ম্মরাজ। এই মন একবার বাঁধন ছিঁড়লে—পৃথিবীর কোন বাধাই তার গতিরোধ করতে পারে না।

মুহূর্ত্ত যুগে এসে পৌঁছল কিনা জানি না, শোভার কান্নার সুর পৌঁছল আমার কানে। ও ঘুমোয়নি, এতক্ষণ ধরে শুধু কেঁদেছে—শুধুই কেঁদেছে!

চেয়ারটা সোজা করে ওকে বসালাম, একখানা টুল টেনে নিজে বসলাম ওর পাশে। বললাম, মাপ চাইব না শোভা—অন্যায় কিছু করিনি। তুমি যতই সরে গেছ—যতই ঢাকতে চেষ্টা করেছ নিজেকে

—আমি তত‌ই কাছে এসেছি তোমার—তত‌ই দেখতে চেয়েছি আমার মধ্যে তোমাকে। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—তোমাকেই আমি চেয়েছি এতদিন ধরে—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তে—

কথাগুলো হয়তো নাটকীয় হল, কিন্তু নটরাজ যে বিশ্ব-নাট্যের দৃশ্যপট তুলে ধরেছেন আমার সামনে—সে দৃশ্যে নায়কের ভূমিকা আমারই।

ওর কাঁধে একখানি হাত রেখে বললাম, আমি কি অন্যায় বলেছি?

কোন উত্তর না দিয়ে শোভা দু'হাতে মুখ ঢাকল।

॥ ৩ ॥

শুভ্রার কথা

কি উত্তর দেব ? ভগবান উত্তর দেবার কোন উপায়ই যে রাখেন নি। সংসারের আর পাঁচজন মানুষ কেমন সহজে চলা-ফেরা করে—সহজে নিশ্বাস নেয়—সহজে কথা বলে—হাসে—গল্প করে—ভালবাসে—আমি কি তাদেরই একজন ? ছেলেবেলায় যমপুকুর পুণ্যিপুকুরের ব্রত করেছি—সেঁজুতির ফুল তুলে আলো জ্বালিয়েছি—বৈশাখ মাস-ভোর গঙ্গামাটির শিব গড়িয়ে পূজো করেছি। একালের মেয়ে হয়েও সেকালের আচার-পূজায় কামনা করেছি—সুন্দর বরের। পাড়াগাঁয়ে মানুষ, পূজাপার্ব্বণে ফুল তুলে, নৈবেদ্য সাজিয়ে, ধূপ জ্বেলে, চন্দন ঘষে মায়ের সাহায্য করেছি। পূজা শেষে দেব-নির্ম্মাল্য মাথায় ধারণ করেছি, চরণামৃত পান করেছি—আরতির দীপশিখার তাপ নিয়েছি দেহে, কপালে পরেছি হোমের ফোঁটা, পা শুদ্ধ কাপড়ে ঢেকে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে নিয়েছি শান্তিজল। কি কামনা করেছি ? কামনা করেছি এমনই একটি সংসারের—শান্তি-শ্রী-সম্পদ-সমৃদ্ধি ভরা সংসারের ! রামের মত পতি পাব, সীতার মত সতী হব। লক্ষ্মণের মত দেবর পাব—কৌশল্যার মত শাশুড়ী আর দশরথের মত শ্বশুর পাব। কুমারী মনের কত সাধ, কত আশা ব্রত পাঠ পূজা পাঁচালী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করে বেড়ে ওঠে—কে করবে তার সীমা সংখ্যা। সমবয়সীরা নতুন শ্বশুর-ঘর ক'রে ফিরে এসেছে।

নির্জ্জনে বসে শুনেছি তাদের শ্বশুরবাড়ীর কথা—স্বামীর ভালবাসার. কথা! স্বামীর কথা ছেলেবেলা থেকেই ভাবি আমরা—বিয়ের অনুকূলে গড়ে ওঠে মনের ভাব। বয়স হলে—বাবা খুলে দিলেন আর এক জগতের দুয়োর। সংসারে শুধু সংস্কার নিয়ে বাস করার কি বিপদ বুঝতে শিখলাম—জ্ঞানের আলো এসে পড়ল মনের ছায়া-ভরা আঙ্গিনায়। তারপর কুক্ষণে এলাম শহরে, কুক্ষণে মিতা আর ব্রজ এল সামনে। . ছুটে পালালাম। তখন তো বুঝিনি—পলায়নের দুঃসাহস কোন্ পথে নিয়ে যাবে আমাকে? যে আগুন জ্বলেছে ওদের মনে—তার তাপ এসে পৌঁছেচে আমার দেহে—আমার মনেও অরণি কাষ্ঠের মত দাহ্য বস্তুতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ব্রজকে ঘৃণা করেছি—পুরুষ জাতকে তো বর্জ্জন করতে পারিনি। তারই দয়ায় এসে পৌঁছলাম নিরাপদ আশ্রয়ে।

ব্রজর সঙ্গে এঁর তফাৎ যে আকাশ পাতাল। ইনি আশ্রয় দিলেন—আশ্রিতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাইলেন না। কুমারী মেয়ে হলেও—পুরুষের দৃষ্টির অর্থ বুঝি। ওটি আমাদের জীবনগত অথবা জাতিগত সংস্কার।

এঁকে দেখলাম আশ্চর্য্য মানুষ। অজ্ঞাতকুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন না। কোথা থেকে এলাম, কি উদ্দেশ্যে এলাম, কোথায় দেশ, কি পরিচয় পিতামাতার—কিছুই শুধোলেন না।

আমি বল্লাম, হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন—দেশে যাব।

বললেন, তথাস্তু।

পৌঁছে দিতেনও হয়তো,—চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়ে—উত্তেজিত হয়ে বিছানা নিলাম। ভাগ্যিস বিছানা নিলাম—তাইতো দেখলাম পরম উদাসীনের মাঝে স্নেহস্নিগ্ধ সেবাব্যাকুল একটি হৃদয়। জ্ঞান আমার হয়তো ছিল না, ছিল না-ই বা বলি কেমন করে! বাইরের জগৎ যাকে আড়াল করে রেখেছিল—সেবার জগতে সে হয়ে উঠল সর্ব্বময়। তাকে

ঘিরে কত স্বপ্নই যে উঠল মনে—জ্বরমত্ত অসুস্থ দেহে সে রইল শীতল চন্দনের মত।

পথ্য পেয়েই জিদ ধরলাম—বাড়ী যাব।

বললেন মমতা-ভরা কণ্ঠে, এখন নয়, দিনকতক যাক—দেহে বলসঞ্চয় করুন।

দিনকতক পরে পুনরায় বললাম, আমায় পাঠিয়ে দিন।

ওঁর মুখ পাংশু হয়ে গেল, চোখে যেন ছায়া নামল। বললেন, আচ্ছা, কালই আপনাকে রেখে আসব। একা ছেড়ে দেব না, সঙ্গে যাব আমি আর আমার এক বন্ধু। যাবেন তো আমাদের সঙ্গে ?

কেন যাবো না ? পৃথিবীতে একজনকেও যদি বিশ্বাস করতে না পারব, তবে মানুষ হ'য়ে জন্মানোর অর্থ কি !

উনি একখানা খবরের কাগজ রেখে গেলেন। আমার পথ্য পাওয়ার পর প্রায়ই রেখে যেতেন কাগজ—এটা ওটা পাঁচ রকম খবর পড়ে যাতে আমার সময় কাটে—মনটা ভাল থাকে।

নিত্য অভ্যাস মত কাগজ নিয়ে বসলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল এক জায়গায়। সেটা এমন কিছু জরুরী সংবাদ নয়—সংবাদদাতার সংবাদ। ছোট গ্রামের সংবাদদাতা—সংবাদ পরিবেশনে কোথায় পাবেন বৈচিত্র্য ? ধান চালের দর থেকে সুরু করে দিয়েছেন সাহিত্য-সভা আর মহকুমা-হাকিমের শফরের কথা। একটি স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর খবর। আর সব শেষে দিয়েছেন যে সংবাদ—তা শুধু দুঃসংবাদ নয়—সে যেন একটা ঘূর্ণীবাত্যা—আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিল পুরাতন জগৎ থেকে।

সংবাদাদাতা লিখছেন ঃ

আজকাল মেয়েদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা এরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে—যাহার উল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। সম্প্রতি গ্রাম হইতে দু'টি অবিবাহিতা তরুণী একটি যুবকের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছে।

যুবকটি প্রথমা রমণীর ভ্রাতৃবন্ধু। সেই সূত্রে গ্রামে তাহার যাতায়াত· ছিল। অপর তরুণীটির সঙ্গে পরে তাহার পরিচয় হয়। দু'টি তরুণীই সম্ভ্রান্ত ভদ্রঘরের মেয়ে। তাহারা যে স্বল্প পরিচয়ে অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করিতে পারে এ কল্পনাও কেহ করিতে পারেন নাই। সপ্তাহ পরে সন্ধান লইয়া জানা গেল, প্রথমা তরুণী ওই অনাত্মীয় যুবকের 'সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করিতেছে। তাহার ভ্রাতা তাহাকে ঘরে ফিরিবার কথা বলিলে সে উত্তর দেয়, ঘরে গিয়া কি লাভ! তোমরা তো অনেক চেষ্টা করিয়াও আমার বিবাহ দিতে পার নাই। আমি স্বেচ্ছায় যাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তাহার সঙ্গ ত্যাগ কবিব না। পুলিশের ভয় দেখাইতে জবাব দিল, আমি নাবালিকা নহি—স্বাধীন ভারতের নাগরিক—আমার খুসীমত যে কাহাকেও পতি-নির্ব্বাচন করিবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে। তাহাবই মুখে খবর পাওয়া গিয়াছে দ্বিতীয়া তরুণীটি আর একটি যুবকের সঙ্গে উধাও হইয়া গিয়াছে। অদ্যাবধি তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমরা শুধু কালের বিষময় ফলের কথা ভাবিতেছি।

ঝড়ের মুখে আমার পূর্ব্ব-পরিচয় উড়ে গেল—বজ্রাহতের মত বসে বইলাম। উনি আপিস থেকে ফিরলে জানালাম, বাড়ী ফিরব না আমি। শুনে ওঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া নামল না—যেন আর একটু উজ্জ্বল হল। অত দুঃখেও মনে কে যেন সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

যদি কোন অনাত্মীয় আমাব চলে যাওয়ার কথা শুনে বেদনা বোধ করে—তার ছলছল চাউনি আর শুকনো মুখ আমার মনে নিশ্চয় ব্যথার ছায়া ফেলবে না—উপরন্তু মন হাল্কা হয়ে উঠবে—সে যে আমাকে বিশেষ একটি দৃষ্টিতে দেখে এইটি বোধ করেই আনন্দ।

একখানি মাত্র কাপড় এনেছিলাম, উনি কাপড় কিনে দিলেন, জামা কিনে দিলেন। দিলেন কিছু প্রসাধনী দ্রব্য। আমার জন্য পছন্দ

করে জিনিস নিয়ে এলেন। অত্যন্ত সঙ্কুচিত হলাম। একে তো আশ্রয় নেওয়ার কুণ্ঠা—তার উপর এই সব দান! জীবন ধারণ করতে হলে মানুষকে কত দিক দিয়ে যে পরপ্রত্যাশী হতে হয়! নেওয়ার মধ্যে আনন্দ তো প্রচ্ছন্নভাবে থাকেই, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও মধুর হয়, গভীর হয়।

অস্থির হয়ে উঠলাম। অবশেষে সুস্থির হল মন। কিছু না পারি যাতে ওঁর আনন্দ লাভ হয় তাও তো করতে পারি। ওঁর ঘর সাজিয়ে, বই গুছিয়ে, জামা কাপড় পরিপাটি করে আলনায় রেখে, ওঁকে প্রসন্ন করতে পারি। উনি যখন ক্লান্ত হয়ে ফেরেন আপিস থেকে—দেখে বুক ফেটে যায়। কিন্তু সেবার সে অধিকার তো লাভ করিনি আমি। হাত পা ধোয়ার জল এগিয়ে দিয়ে, পাখার বাতাস করে, জল খাবার সাজিয়ে গল্প করে ওঁকে সুস্থ করে তোলার ভার তো আমার নয়।

মাসীমাকে একদিন বললাম, উনি দোকানের চা খাবার খেয়ে আসেন—এটা কেমন দেখায় না?

মাসীমা বললেন, আমি বুড়ো মানুষ—কষ্ট পাব বলে এই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তুমি পার তো সে ভার নাও।

সানন্দে তুলে নিলাম ভার। আরও নিকটে এসে দাঁড়ালাম।

কিন্তু বাইরের জগৎ রূঢ়ভাবে এক একদিন সামনে আসতে লাগল। পৃথিবীতে শুধু আমরা দু'জন মানুষই বাস করি না; আমরা শান্তিপ্রয়াসী হলেও অন্যেরা সান্ত্বনা লাভ করবেন এ হিসাব সব জায়গায় মেলে না। কৌতূহলী মানুষ এ বাড়ীতেও কিছু আছে।

মায়া আমারই সমবয়সী—বিবাহিতা। নূতন বিয়ে হয়েছে—বার দুই মাত্র শ্বশুরঘর করে এসেছে। কিন্তু বার দুই যে স্বল্প সময় ওখানে ছিল—তাতে সঞ্চয় করে এনেছে এত কাহিনী যা এক যুগ বলেও শেষ করতে পারবে বলে মনে হয় না। শ্বশুর-বাড়ীর ঐশ্বর্য্য, শাশুড়ী ননদ দেওরের স্নেহ মমতা এবং স্বামীর

ভালবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার···একবার আরম্ভ করলে ওর কথার শেষ হয় না। ও অন্যের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করে না ; নিজেকে নানাভাবে বিস্ফারিত করেই ওর তৃপ্তি।

আমার সম্বন্ধে ওর কৌতূহল জাগল। একদিন বললে, আচ্ছা শোভাদি, তুমি তো তিন চার মাস হলো এখানে রয়েছে—তোমার ভাই কি-বাবা তো একদিনও এলেন না ? তুমি বুঝি বাবার আর পক্ষের মেয়ে ?

ম্লান হেসে ঘাড় নাড়লাম। হাঁ কিম্বা না—যে ভাবেই বুঝুক মায়া।

মায়া বললে, তাই বল ! সৎমা বুঝি খুব দজ্জাল ? আমার শাশুড়ীর শুনেছি এক সতীন ছিল—অনেকদিন থেকে শাশুড়ীকে ঘেঁষতে দেয়নি কাছে। তারপর ওরা এক কৌশল করলেন—শ্বশুর মশায়কে জামাই ষষ্ঠিতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এলেন—ব্যস, সেই আসাই একেবারে আসা। ওইখানেই জমি জমা দিয়ে স্থিতি করালেন। টাকা দিলেন ব্যবসা করতে। সেই ব্যবসার দৌলতে আজ ছ'খানা মোটর, তিনতলা বাড়ী—ঝি চাকর সরকার—জম-জমাট বাড়ী।

মায়া নিজের মুখের গল্প বলে নিবৃত্ত হল—মায়ার মা অত সহজে ভুললেন না। বললেন, তা যাই বল—সোমত্ত মেয়েকে আত্মীয়বাড়ী ফেলে রেখে বাপ মিনসের ভাত রোচেও বা ! লোকনিন্দার ভয় করে না বুড়ো ? একবার দেখা পাই তো—আচ্ছা করে শুনিয়ে দিই ছ'কথা। তা এক কাজ কর শোভা, তুই জোর করে চলে যা সেখানে। সতীনের কাণ্ড—না হলে বিয়ের নামটি করবে না ওরা। আমি বরঞ্চ মাসীমাকে বলব'খন।

না—না—আপনি এসব কথা বলবেন না ওঁকে। বুক ভয়ে টিপ টিপ করে উঠল। এসব কথা আলোচনা করা আমার পক্ষে মারাত্মক।

মায়ার মা হাসলেন। কেমন যেন বাঁকা হাসি। বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে, ও—সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই বুঝি? তা বেশ তো থাক না এখানে। একটা ভাল আশ্রয়ে যখন এসেছ—গতি একটা হবেই। প্রত্যুম্ন তোমার কি রকম ভাই? মামাতো পিসতুতো? তাও নয়? আরও দূর সম্পর্কের? তা দূর সম্পর্কের হলে অবশ্য কাজ-কর্ম্মে বাধবে না। দু'জনে দু'জনকে জানছ দেখছ—দু'জনের মনের মিলও হয়েছে···আচ্ছা আমি না হয় মাসীমাকে বলব কথাটা।

আরও শঙ্কিত হয়ে ওঁর হাত চেপে ধরলাম। আর্ত্তকণ্ঠে শুধু বললাম, না—না।

ও আমার কপাল—এত কাঁপছ কেন? মায়ার মা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না কোন কথা। তবে একটা কথা সাবধান করে দিই—সংসারে তো কিছুই জান না তোমরা। শোন বলি। বলে গলা নাবিয়ে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বিষ ঢাললেন কানে। ও যে যতই আত্মীয় কুটুম্ব হোন—যতই ভাব-ভালবাসা থাকুক—পাকা ব্যবস্থা না করে কথায় ভুলো না যেন। পরে তাহলে পস্তাবে। আমরা তো আজকের মানুষ নই—কতই দেখলাম, কতই শুনলাম!

কোথা থেকে বল সঞ্চয় করলাম জানি না, ছুটে পালালাম ছাদে।

মাসীমা ছাদে বড়ি দিচ্ছিলেন। আমায় ছুটে আসতে দেখে বললেন, কিরে, হল কি? অত হাঁপাচ্ছিস কেন?

উত্তর না দিয়ে ছাদের অন্য ধারে চলে গেলাম। দু'চোখে তখন দরবিগলিত ধারা নেমেছে—মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব হাওয়া ফুরিয়ে গেছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

তবু থাকতে হবে এখানে—এ ছাড়া আমার আশ্রয় কোথায়? পাড়াগাঁয়ের শান্ত কোলে মানুষ হয়েছি, জানি না শহরকে। তবু এই-টুকু জানি—এখানে কেউ কারও পানে চেয়ে দেখে না—চেয়ে দেখার

সময় নাই কারও। পাশের বাড়ীতে প্রিয়জন বিয়োগে মানুষ কাঁদছে—সামনের বাড়ীতে রেডিও খুলে মানুষ শুনছে টপ্পা ঠুংরীর লঘু সুর। বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত বসেছিলাম লালদীঘির গাছের তলায়—জলের স্রোতের মত মানুষ গেছে সামনের পথ দিয়ে, কেউ ফিরেও চায়নি। হ্যাঁ, ফিরে চেয়েছিল কেউ কেউ—কিন্তু কি জ্বলজ্বলে লোভী দৃষ্টিতে—হিংস্র শ্বাপদের মত উজ্জ্বল লোভাতুর দৃষ্টি! শহরের পথে একলা বা'র হতে সাহস হয় না। আমি সাহসী নই। শহরের পথে যদি কোনদিন মিতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—যদি ব্রজ সামনে পড়ে? না, না, পথে বার হতে পারব না আমি। যে যাই বলুক পথ আমার জন্য নয়। ঘরই কি আমার জন্য? আমি জানি না। ছাইভস্ম ভাবতে পারি না এত।

মাসীমার সঙ্গে এই কারণেই কালীঘাটে গেলাম না। অথচ মনটা আমার পড়েছিল মা কালীর পায়ের তলায়। আমার মনে এত ব্যথা জমে আছে যা কারও কাছে না জানাতে পারলে স্বস্তি নেই। মানুষের কাছে এ ভার নামাতে পারব না—যদি ঠাকুরের কাছেও অন্ততঃ মনের বেদনা জানাতে পারতাম!

দুর্গাপূজার সময় ওঁদের কথা ঠেলতে পারলাম না, পথে বার হলাম। সারাক্ষণ কাটল ভয়ে ভয়ে। ভীড়ে মুখ লুকিয়ে চলতে লাগলাম, তবু এড়াতে পারলাম কি দৈবকে? বাগবাজারে সার্ব্বজনীন তলায় ভীড়ের মধ্যে দেখলাম মিতাকে। আমার থেকে হাত তিনেক দূরে হাতজোড় করে মিতা ঠাকুর প্রণাম করছে। মিতাকেই দেখলাম···মায়ের মুখ মুছে গেল সামনে থেকে। একটা ভীড়ের চাপ আমাকে ঠেলে দিলে মিতার দিকে। দু'চোখ বন্ধ করে ডাকলাম, মা।

তারপর জ্ঞান হয়ে দেখি ছোট একটা ঘরে তক্তাপোষে শুয়ে আছি, শিয়রে দাঁড়িয়ে পাখা করছেন মাসীমা। একটু পরে প্রদ্যুম্ন

এল। সবাই ধরে নিল ভীড়ের চাপে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি দুর্ব্বল।

হাঁ আমি দুর্ব্বলই। আমি মায়ের মুখ দেখলাম না—দেখলাম মিতাকে। মিতার জরিপাড় শাড়ী, মিতার কানের দুল, হাতের বরফি-কাটা চুড়ি, মিতার সাদা ধপধপে মুখ, সুর্ম্মা দিয়ে আঁকা দু'টি চোখ, লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর দেখলাম ওর বাঁকা সিঁথি, সিঁথি ধপধপ করছে কুমারী মেয়ের মত। কাগজে পড়েছিলাম যেন—মিতা বলেছে ব্রজকে বিয়ে করবে, কিন্তু বিয়ে করলে ওর সিঁথিতে সিঁদুর নাই কেন? মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল—সেইদিনের অভিসার-রাত্রি যেন কথা কয়ে উঠল।

মিতা একদিন আবৃত্তি করেছিল ঃ

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব।

তাই কি—তাই কি সত্য?

আরও যে বাধা ছিল—জাতিগত, সেটা ক্রমশঃ মুছে যেতে লাগল। সেকালের সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সংসার পাক খাচ্ছে সমস্যায়। আমি যেন কবির ভাষায় প্রতিনিয়ত বলছি ঃ

আমার এ দেহখানি তুলে ধর,
দেবালয়ের প্রদীপ কর।

আমায় প্রদীপ কর, প্রদীপ কর। দূর হোক চারিদিকের অন্ধকার, দূর হোক সংশয়, ভয়, পরবশ্যতার গ্লানি। প্রদ্যুম্ন থাকুক দূরে—আমার কি! চাঁদ লক্ষ যোজন দূরে থাকে, নারকেল পাতা তার আলোয় চিক্‌চিক্ করে। নক্ষত্র থাকে আরও দূরের আকাশে—এক চোখ বুজলে অন্য চোখে তার সুক্ষ্ম রশ্মি নেমে আসে। আমিও যদি দূরে থেকে সঞ্চয় করতে পারি আলো, কার তাতে কি ক্ষতি? এটি বুঝেছি সামান্য সেবার মধ্য দিয়ে—দিতে পারাটাই পরম তৃপ্তিকর।

চললাম এগিয়ে, পিছনে ফেরার উপায় নাই বলে নয়—পিছনে ফিরতে ভাল লাগে না বলেও। তবে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে চললাম, যেন কেউ ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে আমার গোপন সঞ্চয়ের বার্ত্তা।

অন্তর্যামী তখন নিশ্চয় হেসেছিলেন। হয়তো বা বলেছিলেন, কাপড় ঢাকা দিয়ে নিয়ে চলেছ আগুন, উঁচু-নীচু পথে চলেছ পূর্ণকুম্ভ নিয়ে, দাঁড়াও ভেঙ্গে দিচ্ছি তোমার অহঙ্কার। বিশ্ব বিধানকেও ডিঙিয়ে চলবে অবোধ মেয়ে, জান এর শাস্তি?

শাস্তি দিলেন অন্তর্যামী! সেই ঝড়ের সন্ধ্যা, একটু পরে প্রবল বর্ষণ। তার আগে মেঘের কোমল আমেজে মন কেমন জানি স্বপ্নালস হয়েছিল। ঘরের জানালা বন্ধ করতে এসে দেখি টেবিলের ওপর রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

মনে পড়ল বিকেল বেলায় পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল, চাই ফুল। ওদের ঘোঁতনাকে একটা সিকি দিয়ে বলেছিলাম, রজনীগন্ধার ডাঁটি আনবে, যে ক'টা পাওয়া যায়। মাসীমা মাঝে মাঝে পালে পার্ব্বণে খাবার খেতে কিছু কিছু পয়সা দিতেন। কাকে দিয়ে আনাব খাবার, জমিয়ে রাখতাম। ফুল তো কিনলাম, ফুলদান কোথায়? ঘরে ছ'টো কাঁচের গ্লাস ছিল, তার একটিতে জল ভর্ত্তি করে নিলাম। রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলি কাঁচি দিয়ে ছেঁটে একটু ছোট কবে নিলাম। সাজিয়ে রাখলাম টিপয়ে। টিপয়ের উপর ছিল রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা, তাই থেকে বেছে নিলাম একটি কবিতা। চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করলাম কবিতা। কতক্ষণই বা পড়েছি, ছুয়োর জানালা আছড়ে, ঝটাপট শব্দ করে ঝড় এল, এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে চয়নিকাব পাতা উল্টে দিল, আর সেই ঝড়ের সঙ্গে এল বিদ্যুৎ। এরা বললে যেন ঃ

ওরে বাজা শঙ্খ বাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখ রাতের রাজা।

আমার দুঃখ রাতের রাজাও এসে পৌঁছলেন একটু পরে। তারপরই সব বিপর্য্যয়, সমস্তই গেল উলটে পালটে। যে প্রদীপ আঁচলে ঢেকে নিয়েছিলাম, তা আঁচল পুড়িয়ে অন্তর দীপ্ত করে তুলল, যে পূর্ণকুম্ভ নিয়ে পথ চলছিলাম সন্তর্পণে, হোঁচোট খেয়ে তার থেকে সমস্ত জল চল্‌কে পড়ল—আমার সাধ্য রইল না নিজেকে সম্বরণ করবার। আমি যেন অসহ্য সুখে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম অতল সমুদ্রে। বালির বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ভেসে গেলাম স্রোতে।

একবার যদি বাঁধ ভাঙ্গল—সবই ভাসল সেই সঙ্গে। লজ্জা-কুণ্ঠা-সংযম সমস্ত। প্রত্যুম্ন আমাকে পৃথিবী থেকে উত্তীর্ণ করে দিল কল্পলোকে।

প্রত্যুম্ন কিনে নিয়ে এল ফুলদানি—গোলাপ আর রজনীগন্ধা সংগ্রহ করতে লাগল প্রায় প্রত্যহ। আমি ফুলদানে জল ঢেলে সেগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখি ' প্রত্যুম্ন কবিতা আবৃত্তি করে, শুনি। ওর চা খাওয়ার সময়টি আজকাল দীর্ঘই হয়েছে। উপরে মাসীমা জপ নিয়ে থাকেন—সময় নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নাই। সান্নিধ্যের তরণী বেয়ে আমরা অন্তরঙ্গতার উপকূলে পৌঁছই। এমনি ভাবে দিন আর রাত্রি সংক্ষিপ্ত হয়ে কেটে যায়।

কার্ত্তিকের শেষে—নীচের ভাড়াটে শশীবাবু পাশ নিলেন তীর্থে বেড়াতে যাবেন বলে। ভারতবর্ষের প্রায় আধখানা ঘুরবেন তিনি—সময় লাগবে। কাশী-এলাহাবাদ-মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে আগ্রা-জয়পুর-পুষ্কর আর দ্বারকা পর্য্যন্ত। মাসীমা বললেন, আমি যাব।

—কার কাছে ফেলে যাবেন ঘর-দোর? বললাম।

তোমরা রয়েছ কি করতে? এমন সুযোগ ছাড়ব না আমি। তা ছাড়া মায়ার মা রইল—সব দেখবে শুনবে।

কিছুতেই শুনলেন না মাসীমা—তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

কি জানি কেন—তেমন উৎসাহিত বোধ করলাম না। প্রবল বৃত্তি আমাকে যেদিকে আকর্ষণ করছে—তা থেকে ফিরতে পারি সে শক্তি আমার নাই, কিন্তু কোথায় যেন ওর অসঙ্গতি মনকে খোঁচা দিচ্ছে। স্বস্তি পাচ্ছি না। প্রত্যুম্ন কতবার বলেছে—আগুন সোনার খাদ পুড়িয়ে খাঁটি করে—ময়লা আবর্জ্জনা তার কোথাও থাকে না। আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসতে পারি—সেই ক্ষমতাই আমাদের সমস্ত গ্লানি কাটিয়ে শুদ্ধ করে তুলবে।

কতবার প্রত্যুম্নের কথা ভাবি, তবু সংস্কার লেগে থাকে মনে, যেন ফুলের গন্ধ ফুল শুকিয়ে গেলেও রুমালে লেগে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠান জীবনের পুণ্য অধিকার দানের মহিমা ঘোষণা করে। যেখানে অনুষ্ঠান নেই—ভালবাসার জোর সেখানে কতটুকু। সূর্য্যের আলোকে যদি ভালবাসার সঙ্গে তুলনা করি—সে আলো কি সর্ব্বত্র পেঁছিয় ? পেঁছিয় কি সমুদ্রের গভীরে—গুহাশ্রিত তিমিরের মর্ম্মকেন্দ্রে ? বেদের কয়েকটি মন্ত্র—তার অর্থ বুঝি কিংবা নাই বুঝি—ওই কয়েকটি মন্ত্রধ্বনির প্রভাব জীবনে অসামান্য। আমরা বলি ঃ

জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
তিন বিধাতা নিয়ে।

সৃষ্টি, সংহার আর পালন এই তিন অংশে তিন দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা। এই তিন দেবতা ছাড়া আমাদের ভুবনও জ্যোতিহীন।

ভালবাসা এই তিন অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে কি ?

মেনে নিলাম বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই —যে মন্ত্রের অর্থ বুঝি না তার বাঁধনটাও নিশ্চয় সুদৃঢ় নয়, এবং ভালবাসাকে সূক্ষ্ম কোন পদার্থ মনে করে রেখে দিলাম হৃদয়ে—তাহলেই আমার সমস্ত সমস্যা মিটলো কি ? এমন অবস্থায় সংসারেরই বা প্রয়োজন কি ? ওই অশরীরী ভালবাসার স্রোতে যেখানে সেখানে ভেসে বেড়ানোতেই যদি সুখশান্তি লাভ করতে পারি···কিন্তু পারি কি সুখ-শান্তি লাভ

করতে? সংসার আমাদের কখনও কখনও প্রচণ্ড আঘাত করে—অধিকাংশ সময় কঠিন বর্ম্মে ঘিরে রাখে। মাটির রস না পেলে যেমন ফুল ফোটে না—তেমনি সংসারের আশ্রয় না পেলে কি মূল্য ভালবাসার? বিয়েটাকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সংসার ছাড়া মিলন অর্থাৎ ভালবাসা-জাত মিলন—অনেকটা ন্যাড়া ফুলের মত শুধু বৃন্তহীন একটি ফুল—গন্ধ আছে, বর্ণ আছে, সৌন্দর্য্য নাই। আর সংসার ঘিরে রাখে যে ভালবাসাকে যার সূত্রপাত বিবাহ অনুষ্ঠানে—বিকাশ আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-প্রীতির পটভূমিকায়—সে যেন বৃন্ত আর পত্র সমেত একটি ফুল—আনন্দ-নির্ম্মল একটি প্রভাত—পূর্ব্ব দিগন্তে আলোর আভাস—পশ্চিমে ঈষৎ ঘোর ঘোর—এরই সন্ধিক্ষণে অপরূপ পৃথিবী। এই পৃথিবীর সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের প্রণয় সূত্রে বাঁধা আমরা।

প্রদ্যুম্নের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক হয়। ও উত্তর না দিয়ে হাসে। বলে, তোমাদের মন গৃহমুখী, তাই জীবনটাকে দেখ সেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। ঘর ছেড়ে মাঠে এস নেমে—দেখ মাঠের সঙ্গে আকাশের যোগ। এই উপমাটা বেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকাররা। রূপের সীমা অতিক্রম করে অরূপের সীমায় না পৌঁছলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না। যিনি অসীম তিনি তাঁর সৃষ্টিকে টুকরো টুকরো করে লীলা করবেন এটা ভাবতেই পারি না। তা যদি করেন—তা'হলে সেটা তাঁর লীলা নয়—প্রকাণ্ড পরিহাস।

বললাম, যাই বল—আমাদের এই ভালবাসার মর্য্যাদা চাই আমি।

অর্থাৎ বিবাহ? প্রদ্যুম্ন বলল।

তোমার আপত্তি আছে?

কিছুমাত্র না। তোমাকে ভালবাসি এই যথেষ্ট।

আমি যে তোমার স্বজাতি নই?

প্রত্যুম্ন আমার একখান হাত টেনে নিয়ে রহস্য করে, কই দেখি দেখি কি লেখা আছে? কতকগুলো রেখা—কোন জাতির কথা—কিছুই লেখা নেই।

আমার কোন পরিচয় তো তুমি জান না।

নাই বা জানলাম। ভালবাসাই কি আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়? প্রত্যুম্ন গভীর স্বরে বলল।

ওর কথায় অভিভূত হলাম। আমার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা আছে একথা হাজার বার স্বীকার করব—জাতি কি সংসারের গণ্ডী পার হতে পারিনি আমি।

ধর তোমার বাবা—

ত্যাজ্যপুত্র করবেন আমায়? হাসল প্রত্যুম্ন। আমবা তো ধনবানের সন্তান নই—ত্যাজ্যপুত্র হলে কি আর ক্ষতি হবে!

বাপ মার থেকে আলাদা হয়ে পড়বে। তাঁদের স্নেহ ভালবাসাব জন্য প্রাণ কাঁদবে—বাড়ীতে ফিরতে মন চাইবে।

প্রত্যুম্ন একটু চুপ করে থেকে বলল, সবই মানি, বহুদিনের অভ্যাস এক দণ্ডে ছাড়া যায় না। তবু শোভা, যা কিছু ছাড়বাব শক্তি এই যৌবন কালেই পাই আমরা। দেহেব শক্তি নয়- মনের শক্তি। আর মনের শক্তিকে বাড়াতে পারে শুধু ভালবাসা। আমরা অপব্যয় করতে পারি—ক্ষয় করতে পারি, কিন্তু ক্ষতি হয় না তাতে।

বললাম, আজ আমার বলবার কিছু নাই। যা খুসী তোমার কর—কিছু বলব না আমি।

না শোভা, তোমাকে আমি সামাজিক সম্মান দেব। সামান্য উপায় করি—সংসারকে অস্বীকার করব কেন!

সত্যি বলছ?

নিশ্চয়। দেখবে—বাবা আজ পর্য্যন্ত কতগুলো চিঠি লিখেছেন! আর শুনবে কি জবাব দিয়েছি তার?

কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় তো তোমার বেশীদিনের নয়, বিয়েতে মত দাও নি কেন ?

যা পেলে বিয়ে সার্থক হয়—তা পাইনি বলে। প্রাণহীন কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান, কি মূল্য ওর ? আমি জানি না—কোন্ ছেলে শ্রদ্ধার সঙ্গে মন্ত্র পাঠ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে আচার-অনুষ্ঠান ?

প্রদ্যুম্নর কণ্ঠস্বর গম গম করতে লাগলো ঘরে। স্বীকার করলাম—ও মিথ্যা বলেনি।

পরের দিন প্রদ্যুম্ন বলল, আজ চিঠি দিলাম বাড়ীতে—বাবা মার মত চেয়ে।

মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মন বলল, তাঁরা কিছুতেই মত দেবেন না—কিছুতেই না।

আমার আশঙ্কাই সত্য হল। প্রদ্যুম্নর বাবা লিখলেন, এ কাজ যদি কর—জানবে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধের শেষ হল।

আপিস থেকে ফিরে সব কথা বললে প্রদ্যুম্ন।

বললাম, হলো তো ?

কি হলো ! আমার কর্ত্তব্য শেষ হলো। ওঁরা নিজের দিকটা দেখলেন—আমার পানে চাইলেন না। একটু থেমে বলল, হয়তো এইটিই পৃথিবীর নিয়ম। সবাই এই পথের পথিক। যা কিছু মানুষ সৃষ্টি করে—যা কিছু উপার্জ্জন করে কি দৈববশে পেয়ে যায়—তাকেই চিরস্থায়ী স্বত্ব বলে দখল করে। স্থাবর সম্পত্তিও হাতবদল হয়, আর বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ—সে নির্ব্বিচারে মেনে নেবে সব কিছু ?

তাঁরা গুরুজন—

না, কথাটা ঠিক তা নয়। প্রদ্যুম্ন উত্তেজিত হয়ে টেবিলে একটা চাপড় মারল। নিজের পাওনা ষোল আনা বজায় রাখবার জন্য পরের পানে চাইবার ফুরসৎ হয় না যাদের—এ নীতি তাদেরই। তারা ভুলে

যায়—যৌবনের ধর্ম্ম, মানুষের মনের গতি ইচ্ছা করলেই ফেরানো যায় না, কেউ কেউ পারলেও সবাই তা পারে না। যারা দুর্ব্বল তারা তা পারে না, তাদের জন্য তো ক্ষমার বিধান রয়েছে।

প্রদ্যুম্ন উত্তেজনার মুখে আরও বহু কথা বলে যেত হয়তো—বাধা দিলাম। বললাম, তাঁদের যখন এতই আপত্তি কাজ কি আর এগিয়ে?

প্রদ্যুম্ন বলল, সামাজিক সম্মান চাও না তাহলে?

চুপ করে রইলাম। এর অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রদ্যুম্নকে ভালবেসে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি, ফেরবার পথ কই আমার! অধোবদনে ভাবতে লাগলাম।

না শোভা, এভাবে আর চলতে পারে না। তুমি না চাইতে পার আমি চাইবই—যৌবনের বৃত্তিকে যাঁরা ধিক্কার দেন—তাঁদের কণ্ঠ এতে আরও চড়বে। প্রেম মানে যে ব্যভিচার নয়, এটা প্রমাণ করতেই হবে।

মাসীমা ফিরে আসুন।

না, তিনিও সংস্কারমুক্ত নন, গোলমাল হতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে হিন্দুমতে বিয়ের ব্যবস্থা করব আমি। শুধু আমার কয়েকজন বন্ধুকে জানাব। কালই তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ কবে সব কথা বলব। কি, লজ্জা কববে না তো?

না। মনে মনে স্থির করেছি—প্রতিবাদ করব না। এ যাবৎ বহু প্রতিবাদ কবেছি, আর নয়।

বেশ—বেশ। উৎফুল্ল হয়ে উঠল প্রদ্যুম্ন। ব'স শোভা, একটা মেনু ঠিক করে ফেলা যাক।

বললাম শেষ সংকোচ দূব করে, আমাকে আর শোভা বলে ডেকো না—শোভা আমার নাম নয়।

তাই নাকি? হেসে উঠল প্রদ্যুম্ন। ইংরেজ লেখক বলেছেন—নামে কি যায় আসে। গোলাপকে যে নামে ডাক—সে গোলাপই।

মানুষ তো ফুল নয়—যে কোন নামে ডাকলে অন্যের সাধ মেটে, তার নিজের কানে বেসুরো লাগে। আমাকে শুভ্রা বলে ডেকো।

—চমৎকার! দিব্য কবিত্বভরা নাম! আমার অলকগুচ্ছ আল্‌গা মুঠোয় ধরে প্রদ্যুম্ন হেসে উঠল।

ঘরোয়াভাবে চায়ের আয়োজন হল। কিছু নোনতা খাবার—কিছু মিষ্টি আর চা। পান আর সিগারেটের ব্যবস্থা রইল।

প্রদ্যুম্ন বললে, দোকান থেকে নোনতা খাবার আনিয়ে নিলেই হবে।

তার সঙ্গে কিছু ডিমের কচুরি করব ভাবছি।

তিনতলায় রান্নার আয়োজন হল—দোতলায় বন্ধুরা এসে বসলেন। ওদের হাসি-গল্পের কলরব ঘর ছাপিয়ে ছাদে পৌঁছল। সত্যি—কি আনন্দেই না আছে ছেলেগুলি! ওদের সামনে তেমন জটিল সমস্যা নেই—সবাই বোধকরি উপার্জ্জন করে—প্রাণখোলা আনন্দে দিনযাপন করে। বিয়েটা যে-কোন অবস্থাতেই ওদের কাছে আনন্দের—উৎসবের। কোথায় অসাম্য—কোথায় বাধা—সে চিন্তার ভার ওদের নাই।

প্রদ্যুম্ন উপরে এসে বলল, আট কাপ চা তৈরী করতে হবে—আটখানা প্লেট সাজাও। হাঁ, ভাল কথা, ওরা বলছে—তোমাকেই চা পরিবেশন করতে হবে।

আমি! না, না, সে কি করে হবে।—আমার মুখ শুকিয়ে গেল—বুক কাঁপতে লাগল। আমার সে যোগ্যতা নাই। এরা তো জানে—সূর্য্যের আলোর দিকে লতা তার অগ্রভাগ মেলে ধরে কেন? অন্ধকার ঝোপের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে কেন? সে সাহস দুঃসাহসেরই নামান্তর।

প্রদ্যুম্ন বলল, আজকের টি-পার্টি তোমাকে নিয়েই। তুমি আড়ালে থাকলে চলবে কেন!

আমি কি কথা বলব! কিছুই যে জানি না।

কথা বলব আমি—তুমি জিনিসগুলি সাজিয়ে দেবে শুধু। দোহাই—লক্ষ্মীটি।

কারও পানে চাইলাম না—হাতের খাবারের ডিসগুলি একে একে নামিয়ে রাখলাম টেবিলের উপর। প্রত্যুম্ন এগিয়ে দিল জলের গ্লাস। কাপ ডিস গুছিয়ে সকলকার সামনে রাখল প্রত্যুম্ন—খাবার শেষ হলে টিপট থেকে চা ঢেলে দেব আমি। বেশ বুঝতে পারলাম—বন্ধুদের প্রশংসাভরা দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। ওরা মুখে কিছু বলল না—কিন্তু বলার চেয়েও এই নীরবতা বেশী করে অস্বস্তি জাগাল। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল—শাড়ীর আঁচল বারত্নই পিঠ থেকে সরে এল বাহুমূলে—এমন অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ জীবনে করিনি।

কে একজন বলল, প্রত্যুম্ন, সাহায্য কর বৌদিকে, দেখছ না ওঁর কষ্ট হচ্ছে, ঘামছেন।

তখন চা পরিবেশন শেষ হয়ে গেছে—পিছন ফিরছি—পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল, বৌদি, কিছু মনে করবেন না—আপনার নামটি যদি দয়া করে বলেন!

সঙ্কোচ যতই থাক—প্রশ্নকর্ত্তার পানে না চেয়ে পারলাম না। চাইলাম আনত দৃষ্টিতেই—এবং সেই ফাঁকে কাছাকাছি যাঁরা বসেছিলেন তাঁদেরও অবস্থা দেখে নিলাম। হঠাৎ পায়ের তলা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটি বিত্যুৎশিখা যেন স্পর্শ করল আমায়। অদম্য কৌতূহলে বিস্ফারিত হ'ল ত্নটি চোখ—পূর্ণ দৃষ্টিতে ,চাইলাম আর একবার। প্রশ্নকর্ত্তার ডান দিকে যে বসে আছে—চাইলাম তার দিকে। আশ্চর্য্য, সেও বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে আমার পানে অপলকে চেয়ে আছে। একটি মুহূর্ত্তমাত্র চাইলাম তার দিকে -আর মুখ থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল আমার ছদ্মনাম।

ওরা চলে গেলে—প্রদ্যুম্ন তে-তলায় এল। বলল, ওরা সবাই খুসী হয়েছে খুব। আসছে সপ্তাহে একটা দিন আছে ভাল, সেইদিনই শুভ কাজ সারব। শুধু অসিত থাকবে আমার সঙ্গে।

কোন উত্তর দিলাম না।

প্রদ্যুম্ন আমার কাছে এসে বসল। বলল, শোভা, আজ একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ তুমি। যে নামে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়—আমার প্রাণের যোগ—সেই নামটিতেই তুমি বন্ধুদের কাছে পরিচয় দিলে। তোমাকে শোভা বলেই ডাকব আমি। আট-পৌরে নামটিই আমার পছন্দ। আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম—তাহলে শুভ্রা নামে আপত্তি ছিল না।

কেন দিলাম ছদ্মনামে পরিচয়—সে প্রদ্যুম্ন বুঝবে কেমন করে। আমার জীবন আমি হারিয়ে ফেলেছি—হারিয়ে ফেলেছি আমার পুরানো পরিচয়। ছেলেবেলায় পাঠশালায় শ্লেটে লিখেছি প্রত্যেক দিনের পাঠ—পরের দিন জল দিয়ে মুছেছি সে লেখা—নূতন করে লিখেছি পাঠ; জীবন থেকে তেমনি করে পুরাতন পাঠ মুছে ফেলতে পারব না কি?

প্রদ্যুম্ন নিজের খুসীতেই বলে চলেছিল—হঠাৎ ওর মনে হল—আমি কিছু বলছি না তো। ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। বলল, তুমি যে কথা বলছ না শোভা? এস—আমরা চা খেয়ে নিই।

চা খাবার ইচ্ছা ছিল না—খাবার বিস্বাদ লাগল। খালি মনে হচ্ছিল -আজই যদি পালিয়ে যেতে পারতাম কোনখানে! এমন জায়গায় পালিয়ে যাব—যেখানে মানুষের অতীত সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল নেই—সামাজিক মর্য্যাদালাভের জন্য তার মাথাব্যথা নেই—নেই কোন প্রশ্ন—কোন সমস্যা। আছে কি তেমন কোন স্থান পৃথিবীতে?

কিন্তু পৃথিবী যে ফুলে মোড়া নয়, একটু পরেই টের পেলাম।

প্রদ্যুম্ন চলে যেতেই মায়ার মা ঢুকলেন ঘরে। এমনভাবে ঢুকলেন —যেন বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা দরকারী কথা মনে পড়েছে যেটা এই মুহূর্ত্তে না বললে পৃথিবীতে প্রলয় ঘটে যাওয়া আশ্চর্য্যের নয়। বললেন, শুনেছ শোভা, মাসীমা চিঠি দিয়েছেন দ্বারকা থেকে,—এক সপ্তাহের মধ্যেই ওঁরা ফিরে আসচেন।

এ সংবাদে যতখানি আনন্দ পাওয়া উচিত ছিল—আমার মুখে চোখে তা হয়তো ফুটলো না, বরং নিজেকে বেশ কিছু বিব্রত বোধ করলাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটুকু লক্ষ্য করলেন মায়ার মা। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললেন, অবশ্য ট্রেণের পথ—বলা যায় না ঠিক। ফেরবার পথে প্রয়াগ পড়বে, কাশী পড়বে···শীগগীর ফিরবো বললেই তো ফেরা যায় না। বলে হাসলেন। যেন অভয় দিয়ে বললেন, ভয় কি তোমাদের।

ওঁর হাসি সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিল। যথাসাধ্য মনোভাব গোপন করে বললাম, মাসীমা এলে বাঁচা যায়। যাঁর ঘর-দোর তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

ওমা, সেকি কথা! বিস্ময়ে চোখ দুটি ওঁর বিস্তৃত হল। এ-ঘর-দোর কি তোমারও নয়? মাসীমার তিন কুলে কে-বা আছেন। প্রদ্যুম্ন দূব সম্পর্কের হয়েও একমাত্র আত্মীয়। ওঁর যা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সবই তো প্রদ্যুম্নর।

তাতে আমার কি! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। খোঁচা দিয়ে কথা বলা ওঁর অভ্যাস- সেই খোঁচা আমার মনেও উষ্ণতা বাড়িয়ে দিয়েছে, পরক্ষণেই বুঝলাম।

হি হি করে হেসে উঠলেন মায়ার মা।

এমন কৌতুকের কথা যেন উনি বহুদিন শোনেননি। হাসতে হাসতে বসে পড়লেন চেয়ারে। তবু কি ওঁর হাসি সহজে থামে!

মনে হল, আমার বুকের গোড়ায় কে যেন হাতুড়ি দিয়ে ঘা বসিয়ে দেবে। আঘাত পড়বার আগেই আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

মায়ার মা আমার পানে না চেয়েই হাসতে লাগলেন, খানিক পরে একটু দম নিয়ে বললেন, সত্যি শোভা, তোমার কথাটা হলো গিয়ে সেই রকম—সেই যে কথায় বলে না ঃ

যার বিয়ে তার মনে নেই,
পড়া-পড়সীর ঘুম নেই।

প্রত্যুম্ন বাড়ী-ঘর পেলে তোমার কি। উঃ—এতও হাসাতে পার তুমি? আবার হাসতে হাসতে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আঘাতটা পড়ল বটে—আমি তখন পাথর হয়ে গিয়েছি!

হাসতে হাসতে উঠে গেলেন উনি। আর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করলাম নিজেকে। মাথা ঘুরে উঠল, সামলে নিলাম চেয়ার ধরে।

জানি এটা গ্রাম নয়, খুব জানা-চেনা আত্মীয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এখানকার সংসার। পাড়াগাঁ কিংবা শহব যাই হোক, সমাজ জাতি থাকুক কিংবা নাই থাকুক— মনের সংস্কার দূর করার সাধ্য কোথায় আমার। আমি যে অত্যন্ত দুর্ব্বল।

ভালবাসাকে সূর্য্যের আলো ভেবে নিয়ে —চারিপাশের সমস্ত সংশয় অন্ধকার অপগত হলো এই আশ্বাসে পথ চলার সাহস সঞ্চয় করতে পারছি না কেন। ভীরু বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের মেয়ে—পিছনের বাঁধন ছিঁড়ে গেলেও—পিছনের আকাশ মুছে যায়নি—অনুভব করলাম। যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, তা সামনে পিছনের দু'টি কালের মধ্যেই যে ছড়িয়ে রয়েছে।

অতএব মনে মনে বললাম, সামাজিক অনুষ্ঠান আমার চাই। অন্য কারও চোখে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য নয়।

নিজের মনের কাছে জবাবদিহির দায়িত্বটা পুরোপুরি বহন করার জন্যই এর প্রয়োজন। না হলে ভালবাসা যত প্রবলই হোক, নূতন জগতে আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না।

সেইদিন রাত্রিতে প্রত্যুম্ন বলল, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব ব্যবস্থা শেষ করতে হবে। শুনেছ কি—মাসীমা ফিরে আসছেন শীগগির?

ঘাড় নেড়ে জানালাম—শুনেছি।

আজ গিয়েছিলাম বাসাব খোঁজে—কাছে-পিঠে কোথাও সুবিধে মত বাসা পেলাম না।

সসঙ্কোচে বললাম, নাই বা হল কাছে-পিঠে।

প্রত্যুম্ন বলল, কাছে-পিঠে দরকার এই জন্য—আমবা দুজনাই তো নতুন—সংসারে আনাড়ী, হঠাৎ যদি কারও অসুখ-বিসুখ হয়—কি কোন বিপদে পড়ি—জানাশোনা লোক কাছে থাকলে অনেক ভরসা।

চুপ কবে বইলাম।

প্রত্যুম্ন বলল, তাছাড়া আয়-ব্যয়ের হিসেব মিলিয়ে বাসা ঠিক করতে হবে।

বললাম, মাসীমা যদি শোনেন এ সব কথা—নিশ্চয় ক্ষমা করবেন না।

সম্ভবত। প্রত্যুম্ন হাসল। সে-কালেব মানুষ—ওঁর জগৎও সেকালেব। বাবাই যখন মেনে নিতে পারছেন না– ওঁর কি দোষ!

একটু চুপ্ করে থেকে বলল, তবে দূবেই দেখি বাসা, কি বল?

বেশ তো।

বিয়ে সেবে সেই বাসায় গিয়ে উঠব আমরা। একটু থেমে বলল, অবশ্য মাসীমা যতদিন না ফিরে আসেন—এ বাড়ী দেখাশোনা আমাকেই কবতে হবে।

এই বাড়ীতে থেকে? শুকনো মুখে বললাম।

সেইটেই সুবিধা নয় কি? ও প্রতি-প্রশ্ন করল।

মনে মনে বললাম, না, এ বাসায় আর ফিরব না—মায়ার মায়ের সামনে এসে দাঁড়াবো না। না, কোন মতেই নয়। প্রতিবাদের সুরেই হয়তো ঘাড় নেড়েছিলাম।

প্রত্যুম্ন ধরে নিল এতে আমার অমত নাই। ঘাড় নেড়ে ও হাসল।

দোতলায় বসে রান্না করছি—মিণ্টু পা টিপে টিপে আমার পিছনে এসে দাঁড়াল। ভীরু গলায় শুধোল, শোভাদি, তুমি নাকি চলে যাবে এখান থেকে ?

দশ বছরের ছেলে, মায়ার ছোট ভাই। ক্লাস প্রমোশন পেয়েছে এবার। মাঝে মাঝে পড়া বলে নিতে আসে আমার কাছে—আলাপের এইটুকু যা সূত্র। ছেলেটী ভারি মায়াবী। পড়া বলে নেওয়া ছাড়াও যখন তখন কাছে আসে, এটা-ওটা খবর দেয়। কোন জিনিস আনতে বললে খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পড়া বলে দেওয়ার পরিশ্রমকে ফাইফরমাস খাটার পারিশ্রমিক দিয়ে এইভাবে পুষিয়ে দিতে চায়। ছেলেটি আমার অনুগত।

মুখ ফিরিয়ে বললাম, কার কাছ থেকে শুনলি রে মিণ্টু ?

কেন, মা বললেন যে। তোমার নাকি বিয়ে হবে—আর দিদির মত শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে ?

দারুণ উত্তাপে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কিন্তু জানালার দিকে না গিয়ে ঝুঁকে পড়লাম কড়াইএর উপর। খুন্তি দিয়ে তরকারি নাড়তে লাগলাম প্রাণপণে। বুঝলাম ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে ক্রিয়া। কৌতূহলী মন কালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে হোলির আনন্দে যেতে উঠেছে।

মিণ্টু দাঁড়িয়ে রইল চুপটি করে। কড়াইয়ে তরকারি ভাজার শব্দ ক্রমশঃ মিলিয়ে এলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে ও পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, সত্যি চলে যাবে কি ?

দূর বোকা ছেলে! ওকে সান্ত্বনা দিলাম।

ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুক পকেট থেকে একখানা ছবিওয়ালা হ্যাণ্ডবিল বার করে বলল, বেশ ভাল একটা বই এসেছে, যাবে দেখতে?

কোথায়?

এইতো কাছে – অঞ্জলিতে, পাঁচমিনিটও নয় বাড়ী থেকে।

কৌতূহলভরে কাগজখানা নিলাম।

যেমন বিজ্ঞাপনের ভাষা হয় তেমনি। এমন নতুন ধরনের ছবি নাকি এ যাবৎ কোন সিনেমাতে আসেনি। এই ছবি তৈরী করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে—নাম করা অভিনেতারা আছেন এ বইয়ে। এবং এমন একজন সুন্দরী মেয়ে প্রথম নেমেছে এ ছবিতে—যার ভবিষ্যৎ নাকি চিত্রজগতে অত্যন্ত উজ্জ্বল। সেই মেয়েটির ছবিই রয়েছে হ্যাণ্ডবিলে।

কে মেয়েটি? হ্যাণ্ডবিলখানা চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

সুন্দরী মেয়ে। লাস্যময়ী। সুন্দব একটি ভঙ্গীতে ডানহাতে ধরে আছে লীলাকমল, ঘাড়টি ঈষৎ হেলানো, মুখে সুস্মিত হাসি। কিন্তু এ হাসি যে আমার অত্যন্ত চেনা। কে এ মেয়েটি? কে?

অভিনিবেশেব সঙ্গে দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন মাথা ঘুরে উঠল আমাব। দু'হাতে মেঝে ধবে সামলে নিলাম। মিতা? মিতা কি নেমেছে এ ছবিতে? মিতা কেমন কবে আসবে এ জগতে? দূর পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিতা একটি মেয়ে—যার কণ্ঠে সুব নেই, অভিনয় শিক্ষার 'অ আ ক খ' জানে না যে, শহরের আদব-কায়দায় অভ্যস্ত নয়—সে কেমন করে—

হ্যাণ্ডবিলখানা উনুনে গুঁজে দিলাম। ইন্ধন পেয়ে আগুন জ্বলে উঠল—কাগজপোড়া একটা গন্ধ বা'র হল।

খাওয়া শেষ হলে প্রত্যুম্নকে বললাম, একটা কথা বলব—যদি শোন।

কি এমন কথা যা না শোনা অত্যন্ত কঠিন?

ওর পরিহাসে কান না দিয়ে বললাম, একটা বই এসেছে নতুন, কাল দেখাবে?

সিনেমা? অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বলল প্রত্যুম্ন। তুমি তো কোনদিন সিনেমা দেখতে চাওনি শোভা? কতদিন বলেছি—

কৌতূহলের অবশিষ্ট চেহারাটা সেই মুহূর্ত্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। কানের ডগা দু'টোতে কে যেন লঙ্কা বেটে লাগিয়ে দিয়েছে।

আমার লজ্জা দেখে হেসে উঠল প্রত্যুম্ন। বলল, এতে আর লজ্জা কিসের—কালই যাওয়া যাবে না হয়।

মনে মনে বললাম, না, কিছুতেই নয়। যাব না আমি সিনেমায় এই অশোভন কৌতূহলকে কিছুতেই বাড়তে দেবনা। মিতাকে চিন্তা করে আমি নামছি কোন্ রসাতলে? আমার এমন অধঃপতন সুরু হল কবে থেকে? না—আর দেরী নয়, একমুহূর্ত্ত দেরী নয়। আসছে সপ্তাহে—যদি সম্ভব হয় এই সপ্তাহে—পরশু কিংবা কাল আইনমতে বিবাহের অধিকার লাভ করতেই হবে। না হলে পৃথিবী প্রতি মুহূর্ত্তে কঠিন হয়ে উঠছে, মন হয়ে উঠছে পঙ্কিল, মানুষের উগ্র কৌতূহল মনে জমাচ্ছে গ্লানি। নিয়ত অপরাধবোধের.অনুশোচনায় মহৎ প্রেমকেও জীবনের সম্পদ করে তুলতে পারছি না।

প্রত্যুম্ন স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল আমার পানে। আমার মনের আকাশ যে মেঘ জমেছে চোখে মুখে ছিল কি তার আভাস? নাকি কোন অসাবধান মুহূর্ত্তে ওকে জানিয়েছি আমার অসম্মতি?

প্রত্যুম্ন বলল, বেশ পরশুই ব্যবস্থা করা যাবে। বাসাটা মাসীমা আসবার আগে খুঁজে নিলেও চলবে।

কুণ্ঠিতস্বরে বললাম, বাসাটাও চেষ্টা করো যাতে পেয়ে যাও পরশু। এ বাড়ীতে আর নাই বা এলাম।

আর একটু চুপ করে থেকে প্রদ্যুম্ন বলল, বেশ, তাই হবে।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি। চোখে ঘুম নাই। জানালাটা রয়েছে খোলা; সামনে একটুকরো আকাশ। ফিকে নীল আকাশ। কোথায় যেন চাঁদ উঠেছে—তারই আলোয় তারাসমেত আকাশটা ফিকে হয়েছে। একটা তাবা কাঁপছে অশ্রু-ছলছল চোখের মত। কাল চলে যাব এখান থেকে, হয়তো কোনদিন আর আসব না—তাই বুঝি বিদায়ের অচেনা বেদনায় মনটা ভারি হয়েছে। আমার হৃদয়ের বাষ্প বিন্দু হয়ে জমেছে তাবার বিন্দুতে, কাঁপছে তেমনই ছলছল।

যাদের কৌতূহলেব শরাঘাত থেকে আত্মরক্ষা কবতে চাইছি তারাই কি ম্লান বিষাদের ভার নিয়ে আকাশ থেকে নেমে এলো—এই নিশীথে সুপ্তিহীন মস্তিষ্ক কোষ ভরিয়ে তুলল দীর্ঘদিনের টুকরো টুকরো হাসি কৌতুক দরদ উদ্বেগেব মণিমুক্তো দিয়ে?

এমনি ছিল আব একটি সংসাব। সে বুঝি অপর জন্মের কাহিনী।

বাতে শয্যাশায়ী পিতা—একান্ত নির্ভরশীল আমার সেবাকে ভরসা করে কোন মতে কাটছিল তাঁর যন্ত্রণা-দুর্ভর মুহূর্ত্তগুলি। কে জানে তিনি কেমন আছেন? ব্যাধি তাঁকে বেশী আঘাত দিয়েছে, না আমি দিয়েছি বেশী আঘাত? দেহেব যন্ত্রণা কতটুকু—মনের জ্বালার চেয়ে? আমার উপর ভরসা ছিল তাঁর অসীম—আর আমিই কিনা—

এ জন্মও শেষ হবে কাল। নতুন পৃথিবীতে নতুন করে জন্ম নেব। একই জীবন—জন্ম থেকে জন্মান্তর পার হয়ে উত্তীর্ণ হয় কোন্ লোকে? জীবন কি আশ্রয় পায় না কোথাও? শুধু চলে—শুধু চলে। পথের ক্লান্তি সর্ব্বাঙ্গে বহন করে শুধুই চলে! তার গতি শুধু—দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে—অজানা হতে অজানায়।

যথা দিনে প্রদ্যুম্ন তাড়া দিল, আঃ, এখনও হল না তোমার। শীগগির শীগগির নাও, বেলা এগারটার সময় তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব নিউ-মার্কেটে। সেখানে যা যা দরকার কেনাকাটা করব, তার পর যাব অসিতের বাড়ী।

জিজ্ঞাসা করলাম না—কোথায় যাব, কোথায় হবে বিবাহের কাজ? কে সম্প্রদান করবেন কন্যা, কোন্ পুরোহিত পড়বেন মন্ত্র—কুলবধূরা করবেন কি মঙ্গলাচরণ?

বেশবাস বদলে এসে দাঁড়ালাম মা কালীর পটের সামনে। সেদিন মাসীমা কিনে এনেছিলেন পটখানি। ওঁর প্রসারিত বরাভয়-যুক্তকর দেখলে মনে আশা জাগে—শান্তি পাই।

বাইরে অপেক্ষা করছিল প্রদ্যুম্ন—যন্ত্র চালিতের মত ওর অনুসরণ করলাম।

॥ ৪ ॥

প্রদ্যুম্নর কথা

ভাল বিপদেই পড়লাম তো। একটু দূর আসতে না-আসতে ট্যাক্সির টায়ার ফেটে গেল—বিশ্রী একটা শব্দ করে গাড়ীটা থেমে গেল। একটা নয়—এক সঙ্গে ত্নটো টায়ার ফেটেছে—কোন আশা নেই।

বেলা সাড়ে দশটা বাজে—কর্ম্মব্যস্ত কলকাতা। একখানি গাড়ীও খালি নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে ট্রাম লাইনের ধারে এসে দাঁড়ালাম। সব গাড়ী ভর্ত্তি, ভাগ্যক্রমে একখানা গাড়ী থামতে হুড় হুড় করে জন ত্রিশেক লোক নেমে গেল—শোভাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লাম সেই গাড়ীতে। শোভা বসবার জায়গা পেল—আমাকে দাঁড়াতে হ'ল পিছনে। পিছনে খানিকটা হটেছি—হঠাৎ একজনের গায়ে টলে পড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, মাপ করবেন।

অমল হেসে বলল, সেটা উভয়তঃ। কিন্তু এই সকালে ওঁকে নিয়ে চলেছ কোথায়?

বললাম অন্যের অশ্রুত স্বরে, বিয়ের কাজটা আজই সেরে ফেলব ভাবছি। সবাইকে বলবার ফুরসুৎ পেলাম না—

বেশ করেছ বলনি। বলে ও চুপি চুপি বলল, একটা কথা বলব—যদি কিছু মনে না করিস।

কি কথা ?

বিয়েটা তাড়াতাড়ি নাইবা করলি ? আগে সব পরিচয়টা নে।

নিয়েছি পরিচয়।

নিয়েছিস পরিচয় ? সব ? অবাক হয়ে চাইল আমার পানে। যেন এত বড় দুঃসাহসের কাজ এ পর্য্যন্ত কেউ করেনি। একটু থেমে বলল, যে দেশে সামাজিক মর্য্যাদা নিয়ে মানুষ তেমন মাথা ঘামায় না—সেই দেশের একটা গল্প পড়েছিলাম—য়্যামা দি পিট্। তাতে পতিতা নারীদের সংসারে স্থান দেবার একটা পরীক্ষার কথা যেন আছে। সে ফলও ভাল হয়নি।

চাপা উত্তেজনায় আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। বললাম, এ গল্প বলার উদ্দেশ্য ?

আস্তে। বন্ধু আমার গা টিপল। এক গাড়ী লোকের সামনে কেলেঙ্কারীটা না বাড়ানোই ভাল। একটা কথা ভেবে দেখেছ কি—যাকে বিয়ে করতে চলেছ তার চরিত্র তুমি—

—চুপ– চুপ। ওর কাঁধ চেপে ধরলাম।

ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ী থামল।

অমল বলল, কিছু জানি বলেই বলছি একথা। না শোন, নাই শুনবে।

গাড়ী ফের চলতে সুরু করেছে।

শুনব। শুনব। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

এখানে কি কথা বলার জায়গা ?

চল, নামি। বলে ঘণ্টার দড়িটায় সজোরে টান দিলাম।

গাড়ী থেমে গেল—আমিও কোন দিকে বিচার বিবেচনা না করে অমলের হাত ধরে নেমে পড়লাম।

ফাঁকা মাঠে একটা গাছের ছায়ায় এসে বসলাম দু'জনে।

অমল পকেট থেকে সিগার কেসটা বের করে একটা সিগারেট ধরাল। আমায় বলল, নে একটা।

নিলাম একটা সিগারেট। উত্তেজনার মুখে নিজেকে অসহায় বোধ করছিলাম। সিগারেটটা একটা অবলম্বনের মত মনে হল। বললাম, বল।

ধোঁয়া ছেড়ে অমল বলল, কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করব তাই ভাবছি। আচ্ছা, পরশুকার থেকেই বলি, কেমন? চা ঢেলে দিয়ে উনি যখন চলে যাচ্ছিলেন—আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওঁর নাম, মনে পড়ছে? আমার জিজ্ঞাসায় উনি ফিরে চাইলেন—দেখলাম মুখখানি সাদা হয়ে গেছে। কি যেন বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। তারপর নামটা বলেই একরকম ছুটে পালালেন সামনে থেকে—অন্ধকার বাড়িতে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলে চোর যেমন ছুটে পালায় প্রাণভয়ে—তেমনি আর কি। তুই তখন ওধারে মনুজদের সঙ্গে গল্প করছিস। আমার পাশে বসে ছিল রঞ্জিৎ—সে লক্ষ্য করেছিল ব্যাপারটা। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, একবার মাত্র রঞ্জিতের দিকে চেয়েই ওঁর এই ভাবান্তর হল। বললাম রঞ্জিৎকে, কিরে—ব্যাপার কি?

রঞ্জিৎ আমার গা টিপে বলল, বলব পরে।

এলাম রঞ্জিতের সঙ্গে গোলদীঘিতে। একেবারে বেড়ার গা-ঘেঁসে বসে বললাম, ব্যাপার কি? ও বলল, তুমি আমি—অর্থাৎ বোকার দল সমুদ্রের কূলে বসে ঢেউ গুনছি—আর কবিতা পড়ছি। লিখতে জানলে হয়তো লিখতাম। আসল মজা লুঠছেন ঝানু ডুবুরির দল। হাসি নয়, আমার কাছে কাটিংস আছে—যেখানে যত রত্নসন্ধানী ডুবুরি আছে তাদের কীর্ত্তি কাহিনীর কথা আছে। কোন কেস কোর্টে গড়িয়েছে, কোথাও আপোষরফা হয়েছে, কোথাও বা সাবালকত্বের নজীরে বেকসুর খালাস পেয়েছেন কীর্ত্তিমান। এই কীর্ত্তিমানদের এক-

জনকে আমি জানি। আমাদের বাড়ীর অন্য অংশের তিনি ভাড়াটে। চাকরি করেন—মার্চ্চেণ্ট আপিসে। বিয়ে করেন নি, কিন্তু রত্নের সন্ধানে সর্ব্বদাই ফেরেন। বাড়ীতে তার মা, বোন, ভাই আছে। তারা তো আর চাকরি করেন না, চাকুরে ছেলে আর ভাই-এর অন্নে প্রতিপালিত। কাজেই সংসারে তারা অবান্তর। সেই চাকুরের হুকুম মত তারা কখনও কালীঘাট, কখনও বরানগর, কখনও বা অন্যত্র যায়। তারা চলে গেলে এঁর বন্ধু-বান্ধব কিছু আসে। স্ত্রী-এবং পুরুষ-বন্ধু দুইই। খানা-পিনা, আলাপ-হাসি চলে। আপত্তিকর কিছু পাই না বলে পাশের বাড়ীর আমাদের আপত্তি করবার অবসর ঘটে না। এসব ঘটে দু'চার দিনের জন্য, তারপর মা বোন আসেন—সংসার চলে আগেকার মত। মাসকতক আগে ওর মা বোন বরানগর চলে গেল—ও গেল কোন বন্ধুর বাড়ীতে মফঃস্বলে। সেখান থেকে ফিরে এল দু'টো মেয়েকে সঙ্গে করে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সর্ব্বাঙ্গে শহরের ছাপ। তেমনি কাপড় পরা, জুতো পায়ে—ঠোঁটে লালিমা—মুখে পেণ্টের হালকা টান। পাশের বাড়ী থেকে সবই দেখি শুনি—আর বলাবলি করি, কে ওরা? ওরা পার্কে বেড়ায়, মিউজিয়াম দেখে—চিড়িয়াখানায় ঢুঁ মারে—সিনেমা তো প্রতিদিন বাঁধা। ওদের একজন খুব স্মার্ট—আর একজন কেমন যেন আড়ষ্ট! সে সিনেমায় যায় না—বেড়াতে যাওয়াতে তার আপত্তি। চটুলার নাম মিতা—আর মন্থরা (মানে রামায়ণের কৈকেয়ীর দাসী-মন্থরা নয়—তার নাম মন্থরা হলেও আসলে সেই সাতকাণ্ড রামায়ণটার গল্পকে গতি দিয়েছে। সে প্রচণ্ড গতিময়ী।)—হাঁ, মন্থরার নাম হলো গিয়ে শুভ্রা।

আমার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা খসে পড়ল—অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলাম।

অমল বলল, না থাক গল্প—তুই হয়তো সহ্য করতে পারবি নে।

না না—সবটা বল। সবটা শুনব আমি, সমস্ত শুনব। মাথাটা আবার দপ্ দপ্ করছে—কে যেন কঠিন দু'পায়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে আমার স্বপ্নের পৃথিবী।

অমল বলল, তারপর রঞ্জিতের কথাতেই শোন। রঞ্জিৎ বলল, আমরা সুযোগ প্রতীক্ষায় রইলাম। কিছু যদি বেচাল দেখি—বাছাধনকে আচ্ছা করে শিক্ষা দেব। সে সুযোগ আসবার আগেই ওই শুভ্রা মেয়েটি আমাদের আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে সরে পড়ল। মিতা আর ব্রজবাবু সেদিন দুপুরবেলা কোথায় যেন গিয়েছিল। • সম্ভবতঃ শ্যূটিং দেখতে। ক'দিন থেকে মিতা বলছিল—ওকে শ্যূটিং দেখাতে নিয়ে যেতে হবে।

তারপর ?

তারপর ওরা তো বাড়ী ফিরে অবাক! খানিক গজ গজ করল ব্রজবাবু—তারপর বলল, ও মেয়েটা তো কম শয়তান নয়। যদি দেশে ফিরে যায়—মিথ্যে করে আমাদের নামে কতকগুলো যা তা কথা বলে, ভাব দেখি কি দাঁড়াবে অবস্থা ?

পরে বুঝলাম, মেয়েটি দেশে ফিরে যায় নি—এই মহানগরীর অরণ্যে কোথায় পথ হারিয়েছে। বড়র আশ্রয় পেয়েছে। সপ্তাহ পরে একটা খবর বার হল—কাগজের কাটিংস রেখেছি। গ্রামের সংবাদদাতা সংবাদ দিচ্ছেন—তাঁদের পাশের গ্রাম থেকে দু'টি মেয়ে একসঙ্গে উধাও হয়েছে। সেই দুটি যে এরা নয়, তার ঠিক কি ? কাটিংস রেখে দিলাম ফাইলে—তার পরে কোথায় দাঁড়ায় ব্যাপাব জানতে হবে। অমল থামল। ওর সিগারেটটি ফুরিয়ে গিয়েছিল। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে ও বললে, তারপর সেদিন তোর চায়ের নেমন্তন্নে রঞ্জিৎ ওকে দেখল। ও নাম বলল—শোভা। রঞ্জিৎ বাইরে এসে আমায় বলল, ও মিথ্যে বলেছে—ওর নাম শোভা নয়, শুভ্রা।

বললাম, তাতে কী! নাম ওর যাই হোক—সে নিয়ে 'আমাদের কেন মাথাব্যথা?

রঞ্জিৎ বলল, প্রত্যুম্ন যদি আমাদের বন্ধু না হত—তা'হলে মাথাব্যথা থাকত না। যা করে হোক, মেয়েটার পূর্ব্বপরিচয় ওকে জানাতেই হবে।

আমি অধৈর্য্য কণ্ঠে বললাম, কালও তো আমাকে জানাতে পারতে, তা'হলে—

তুই যে এত শীগ্‌গির ফাঁস গলায় পরবি—জানব কেমন করে? যাক্—ভগবান আছেন, তাই তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ।

অমলের হাত চেপে ধরলাম। বললাম, চল রঞ্জিতের ওখানে যাই—আমি নিজ কানে ওর মুখ থেকে সব শুনব।

কেন, ভাবছিস বাড়িয়ে বলছি? সত্যি বলছি—এক বর্ণও আমার বানানো নয়।

তা হোক চল।

এলাম রঞ্জিতের বাড়ী—ও কাপড় জামা পরে কোথায় বার হচ্ছিল। আমাদের বৈঠকখানা খুলে বসাল।

অমল বলল, এইমাত্র সব বললাম প্রত্যুম্নকে—ও তো আজই মেয়েটির পাণিগ্রহণ করতে যাচ্ছিল।

তাহলে বড় অন্যায় করেছ অমল। রঞ্জিৎ গম্ভীর হল।

কিন্তু তুই তো সেদিন বলেছিলি—

তুই আস্ত আহাম্মক, মনের অলি-গলিতে কি ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান করিস না কিছুই। আমি কার্য্যকারণেব সূতোগুলো এক করছি—যদি আস্ত ঘটনাকে জুড়তে পারি—ভাল একখানা উপন্যাস হয়ে যাবে বুঝলি?

এর আর উপন্যাস কি, সবটাই তো স্ক্যাণ্ডাল।

দূর গাধা! আসল রসই তো পরকীয়াতে!

বিরক্ত হয়ে বললাম, রাখ তোমাদের বাজে আলোচনা। তুমি কি করে বুঝলে মেয়েটির চরিত্র ভাল নয়?

কি বিপদ! তাই কি বললাম আমি? কিরে অমল তাই বলেছি তোকে? আমি একটা ঘটনার সূতো খুঁজে পেয়েছি—এর পরিণাম কি হয় জানবার আগ্রহ অবশ্য আছে।

কিন্তু অন্য মেয়েটি তোমার হাতের নাগালে রয়েছে—তার কাছ থেকেই অনায়াসে সব জেনে নিতে পার।

মেয়েরা হাতের নাগালে থাকলেও, ওদের মনের নাগাল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এটিও তো মাসখানেক হল উধাও হয়েছেন।

অ্যাঁ—বল কি!

রোজ সিনেমায় যাওয়া আর শ্যুটিং দেখা—যে নেশা ধরে মনে, সেই নেশার ঘোরেই ঘর ছাড়ে ওরা। শুনছি—একটা ভাল কনট্রাক্ট পেয়েছে—চেহারা আছে মেয়েটার—উতরে যেতেও পারে।

অমল বলল, তাহলে তোমার ব্রজরাজের কি অবস্থা এখন?

রঞ্জিৎ বলল, ব্রজরাজের কাছে প্রেমের মূল্য কাণাকড়িও নয়। ওরও কিছু লাভ হয়েছে এবং ওই হয়তো ঘটিয়েছে এই যোগাযোগ। আপিসের মাইনে ওর সামান্য, এইভাবে পাঁচ রকমে বাড়ীভাড়া দিয়ে একটা মাঝারি ফ্যামিলি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তো শহরে।

দু'টি মেয়েই যে এক গোত্রেব এ সিদ্ধান্ত তোমার ঠিক নাও হতে পারে। বললাম।

সম্ভব। কিন্তু হাতে যেটুকু প্রমাণ আছে তাই মিলিয়ে দেখব বলেই এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। দরকার হলে ওদের গ্রামেও যাব।

কোথায় ওদের গ্রাম—চিনবে কেমন করে?

কেমন করে? এই দেখ। বলে খবরের কাগজের সংগ্রহ-ফাইলটা ও এগিয়ে দিল।

সংবাদদাতার রিপোর্ট পড়লাম—গ্রামের নাম জানলাম। এখন

বুঝতে পারছি—কেন শুভ্রা সকালে দেশে যাব বলে বিকেলে করল অস্বীকার। কেন বাড়ীর বার হতে ওর এত আপত্তি।

খানিক চুপ করে থেকে বললাম, তোমার ব্রজবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।

খেপেছ ব্রাদার! রঞ্জিৎ আমার পিঠ চাপড়ে নিরুৎসাহ করল। বেশী খোঁজ নিয়ে তোমার কি-ই বা লাভ! কাঁচা মনের রঙটা চড়া বলেই জ্বল্ জ্বল্ করছে—কিন্তু এ রঙ ধোপে টেঁকে না।

তুমি জান না রঞ্জিৎ—

স্বীকার করছি—প্রেমে পড়িনি, কিন্তু প্রেমজাতীয় জিনিস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছি। এই ফাইলে দেখছ তো অসংখ্য কাটিংস। ওদের পরের জীবনের ইতিহাস আমি জানি। কাঁচা মনের ঠেলা খেয়ে ওরা যত এগিয়েছে সামনে—পৃথিবীর কঠিন মাটি—ঘা দিয়ে দিয়ে ততই ওদের ঠেলে দিয়েছে ভিন্ন দিকে। এখন কেউ ওরা তিন-চার ছেলের মা, ভাল গৃহিণী, কেউ বা ধনী ব্যবসায়ী কিংবা গবীব কেরাণী। ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখো—কি বলে। বলবে—বয়সকালে অমন একটা ব্যাপার প্রায়ই হয়। মনটা যে তুরন্ত। দেখনি তুরন্ত ছেলেকে—যতই সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্র করে রাখ—ধূলো কাদা মেখে ততই সে বেয়াড়াপনা কবে। কুকুরকে নাইয়ে দিলেই ধূলোয় গড়াগড়ি দেবেই। অতএব আমার এই অনুরোধ—এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না।

কবির কথা স্মরণ কর ঃ

'ফুরায় যা তা দেরে ফুরাতে,
ছিন্ন-মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নে ক' কুড়াতে।'

অমল হাততালি দিয়ে উঠল, সাবাস—সাবাস।

হাততালি দিলেও উৎসাহ পাচ্ছি না ব্রাদার। রঞ্জিৎ কপট গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিল। প্রত্যুম্ন পেঁচার মত মুখ করে রয়েছে—মেয়েটা

ওর মনেতে' রঙের পোঁচটা বড্ড বেশী করেই লাগিয়েছে দেখছি। আচ্ছা—আচ্ছা—আমার অনুসন্ধানের ফল তোমাকে জানাব ব্রাদার—দেখ যদি রঙটা ফিকে হয়!

সারা পথ নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। ভালই হয়েছে—এত শীঘ্র যে দুঃস্বপ্নের অবসান হল—একপক্ষে ভালই। মন কিন্তু ঘুরে ফিরে সেইখানেই চলে যায়। ট্রাম চলে যাচ্ছে—একটি সহায়হারা মেয়ে একান্ত নির্ভয়ে বসে আছে লেডিজ সীটে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে আমার দিকে। ওর বড় ভয় পাছে আবার হারিয়ে যায়। পথকে ও ভীষণ ডরায়—জনারণ্যে ও হাঁপিয়ে ওঠে। ছুটে চলেছে ট্রাম—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি। শহরের জনতায় ওকে ছুড়ে ফেলে দেবার নিষ্ঠুরতা কোথা থেকে সঞ্চয় করলাম আমি? একান্ত নির্ভরতা নিয়ে আমার হাত ধবে পথে পা দিল যে—তাঁকে ঠেলে ফেললাম বর্ব্বরের মত কোন্ অন্তহীন অন্ধকারে? সে যদি হয় অপরাধিনী—আমার অপরাধটাই বা কম কি!

দুয়ার খুলে লুটিয়ে পড়লাম বিছানায়। বুক ঠেলে কান্না আসতে লাগল। কোথায় গেল শোভা—কোথায় হারিয়ে গেল সে?

ঘর তখন বজনীগন্ধার ঘন গন্ধে ভরে আছে—কালকের বাসি ফুলেও এত গন্ধ! বইগুলি পরিপাটি করে সাজানো—বিছানায় ধবধবে চাদর টান-টান কবে পাতা। ঝালর দেওয়া বালিশে রঙীন একটি তোয়ালে—তাব মাঝখানটিতে লাল টক্‌টকে একটি গোলাপ ফুল। শোভার হাতের প্রথম ফুল—পাশের ঘরের মেয়েটির কাছ থেকে ও সেলাইএর কাজ শিখেছিল।

কেমন করে ঘর সাজানো উচিত—সে ছবিটিও মুখে মুখে কতবার এঁকেছে শোভা। ঘরখানি ঘিরে ছিল ওর সমস্ত মন—ওর যৎসামান্য বয়ননৈপুণ্য—ওব সেবাব আকুতি। এমনই নিয়তির বিধান—এই ঘরে ঠাঁই হল না ওর!

ক্যাঁচ করে দুয়ার খোলার শব্দ হল। মায়ার মা দুয়ারের ওপিঠ থেকে ডাকলেন, ঠাকুরপো, শোভাকে কোথায় রেখে এলে?

উত্তর দিলাম না।

উত্তর না পেয়ে উনি চলে গেলেন। একটু পরে ওঁর ছোট মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। সে এসে জিজ্ঞাসা করল, দাদা, মা জিগগেস করছে রাত্তিরে আপনি কি খাবেন?

কিছু খাব না—খিদে নেই।

মেয়েটি মায়ের কথাই আবৃত্তি করল, মা বলছে—রাত্তিরে উপোস দিতে নেই—ওতে নাকি হাতীও কাহিল হয়ে পড়ে।

তোমার মাকে বলোগে—সত্যিই আমার খিদে নেই।

মেয়েটি চীৎকার করে উঠল, মা, দাদা বলছে খিদে নেই, কিছু খাবে না।

থাম মুখপুড়ি—খুব হয়েছে। মা চাপা ধমক দিলে। কাকীমা নেই—শোভা নেই—ঠাকুরপো কি নিজে কোনদিন রান্না করে খেয়েছে তাই বুঝবে কখন খিদে পায়—আর কি খাবার তৈরী করতে হয়? আমরা যদি না দেখব তো—

দুয়োরটা বন্ধ করে দিলাম। ভালো লাগছে না—এই মমতা—এই আত্মীয়তা! সুখ-স্মৃতির ফুলগুলি চারদিকে বিছিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যে বিশ্রাম করব সেটুকুও বুঝি অদৃষ্টে নাই।

শোভার পরিচয় প্রতিটি জিনিসে লেখা রয়েছে—শোভার স্মৃতিতে মন আমার পরিপূর্ণ। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে বসে কার প্রাণটা না হু হু করে ওঠে!

॥ ৫ ॥

মিস্ সান্যালের কথা

পাশে এসে বসেছিল মেয়েটি— চলন্ত ট্রামে কে এসে পাশে বসে—কে কখন নেমে যায়—সে হিসাব বাখা সম্ভব নয়। মেয়েটির কান্নাব শব্দ শুনে পথেব দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে গাড়ীব ভিতবে চাইলাম। সামনে কন্‌ডক্‌টব দাঁডিযে—আব আমাব পাশেব মেয়েটি ছু'চোখ লাল কবে ফোঁপাচ্ছে।

বললাম, কাঁদছেন কেন? সঙ্গে যদি কেউ থাকেন—তাঁকে বলুন—টিকিট কেটে নিন। সঙ্গে কেউ নেই?

মেয়েটি ঘাড কাত কবে বলল, ছিলেন তো—কিন্তু তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি নে। তিনি কি নেমে গেলেন?

তাহলে তোমাব ভাড়াটা দিয়ে দাও।

মেয়েটিব ছু'চোখে দবিগলিত ধাবা নেমে এল। ও বলল. আমাব কাছে তো একটিও পয়সা নেই।

পয়সা নেই? তা যাবে কোথায়?

মেয়েটি বলল, তা তো জানি না।

কোথা থেকে আসছ?

গলিব নামটা জানিনে। কালীঘাটেব কাছে কোথাও হবে।

আমাদেব আশে-পাশে বহু কৌতূহলী চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখলাম। চলন্ত ট্রামে—ওর চেয়ে বেশী প্রশ্ন করে ওদের কুৎসিৎ

কৌতূহলকে বাড়ানো আর যুক্তিযুক্ত নয়। পকেট থেকে পয়সা বার করে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। বললাম মেয়েটিকে, নামবে আমার সঙ্গে ? আমি কমলা বোর্ডিংএর সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট। ইচ্ছে করলে দু'একদিন থাকতেও পারবে আমার সঙ্গে।

মেয়েটি অকূলে কূল পেল।

তখন কাছাকাছি লোকগুলি হাঁ করে চেয়ে আছে আমাদের পানে। ক্রমে গাড়ীটা ডালহৌসী পরিক্রমা সুরু করল। পিছনে আপিসের তাড়া; অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে লোকগুলি একে একে নামতে লাগল গাড়ী থেকে। আমিও মেয়েটিকে নিয়ে নামলাম। নেমে লালদীঘির পামকুঞ্জে গিয়ে বসলাম।

বললাম, এইবার শুনি তোমার কথা। আচ্ছা, তুমি তো বাড়ী ফিরে যেতে পার ?

না, পারি না। বলল মেয়েটি। একটু আগে বেরিয়েছিলাম, কাজটা শেষ করে বাড়ী ফিরতে পারতাম।

ব্যাপারটা খুলে বলবে কি ?

বলব। আপনি ছাড়া কেউ নেই আমাকে সাহায্য করতে। বলে মেয়েটি জলভরা চোখে চারদিক চেয়ে নিল। তারপর মুখ নামিয়ে আমার পানে না চেয়েই বললে, ভবানীপুরের যে বাড়ীতে আমরা থাকতাম—

বাড়ীটা বুঝি তোমাদের নয় ?

না। ছেলেটির দূর সম্পর্কের এক মাসীমার।

বুঝেছি—ছেলেটিকে তুমি ভালবাসতে।

আমার প্রশ্নে মেয়েটি আরও ঝুঁকে পড়ল মাটির পানে। নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, হাঁ। তারপর কাল সন্ধ্যাবেলায় ঠিক হলো—আজই বিয়ে করব আমরা। হিন্দুমতে না হয়—সিভিল অ্যাক্টের আশ্রয় নেব।

কেন—হিন্দুমতে বাধা কি ?

ছেলেটি ব্রাহ্মণ—আমবা কায়স্থ।

ও। তা ছেলেটিব বাবা মা আপত্তি করেন নি ? তাঁবা কোথায় থাকেন ?

তাঁবা দেশে থাকেন—পাড়াগাঁয়ে। তাঁদের আপত্তি তো হবেই। সেইজন্যই—

তোমাব বয়স কত ?

মেয়েটি সোজা উত্তব না দিয়ে বলল, ওঁব মুখে শুনেছি আইনে আটকায় না।

তাবপব ?

তাবপব ট্রামে আসছিলাম দুজনে।

মেয়েটি চুপ কবে গেল।

বললাম, বুঝেছি—ছেলেটি সবে পড়েছে। তা এতে কান্নাকাটি কেন ? যেখানে ছিলে আপাততঃ সেইখানে ফিবে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেখানে কেমন কবে যাব—পথ চিনি না—নম্বব জানি না বাড়ীব।

সে কি ! তুমি কতদূব পড়েছ ?

ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত।

অথচ যে বাড়ীতে আছ তাব নম্বব জান না—বাস্তাব নাম জান না ? ভাবী বোকা মেয়ে তো ! পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হলেও তো মেযেবা এত বোকা হয় না।

নম্বব জানলেও সে বাড়ীতে ফেবা চলত না। মেয়েটি আস্তে আস্তে বলল।

কেন—কেন ? কৌতূহল বাড়ল আমার। মেয়েটি তখনও কি যেন চেপে যাচ্ছে মনে হল। ছেলেটির অন্তর্দ্ধানের রহস্য ওর অজ্ঞাত নয় যেন।

মেয়েটি পুনরায় মাথা নামিয়ে বলল, সে কথা বলতে 'পারব না। অথচ না বললেও নয়।

ওর এই হেঁয়ালি-মাখা জবাবে বিরক্ত হলাম। বেশ বুঝলাম ব্যাপারটা রোমান্টিক—অনেকদূর গড়িয়েছে। আজকালকার দিনে এমন প্রায়ই হচ্ছে। এই অনুরাগের ফলে অসবর্ণ বিবাহ ছাড়া গত্যন্তর কি! কিন্তু ভালবাসাই যদি জন্মেছে ওদের তো এতদূর এগিয়ে এসে ট্রাম থেকে নায়কের অন্তর্দ্ধানের হেতু কি! বোধ হয় খুব ভয় পেয়েছে—তাই এমন অসংলগ্ন কথা বলছে।

ওকে আশ্বাস দেবার জন্য বললাম, বোধ করি তুমি খুব ভয় পেয়েছ—আর সেইজন্যই ভুল বুঝছো। বলছ ছেলেটি তোমার জানা-শোনা, থাকতে তারই আত্মীয়-বাড়ী। তা বেশ তো,. তোমার সঙ্গে দেখা হলে সে নিশ্চয় তার ভুল বুঝতে পারবে। বলতো আমি সাহায্য করি তোমায়।

না—না—সে বাড়ীতে যাওয়া চলবে না—কিছুতেই না! মেয়েটি আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল।

ভালো বিপদেই পড়লাম তো! একে নিয়ে কি করি এখন! অবশেষে বললাম, বুঝেছি—ছেলেটি বেকার। দায়িত্ব নেবার ভয়ে সরে পড়েছে।

না—না—তিনি ওই যে বড় বাড়ীটা রয়েছে—ওরই পাশের হলদে বাড়ীটায় কাজ করেন। মার্চ্চেন্ট আপিসে।

বেশ তো—এতক্ষণে সে নিশ্চয় আপিসে এসে গেছে। আপিসেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা যাবে। কি বল—যাবে?

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়—নিশ্চয়। একটু থেমে বললাম, তার আগে সব খুলে বল আমায়। তোমার বাড়ী ফিরে যাবার কি বাধা?

মেয়েটি সরে এল আমার কাছে। কানের কাছে মুখ নামিয়ে ভীরু কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে যা বললে—তাতে চমকে উঠলাম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর আপাদ-মস্তক দেখে নিলাম। হাঁ—এইটাই হওয়া সম্ভব। দেশে বেকার সমস্যা বাড়ছে, বিবাহের উপযুক্ত ছেলেরা সংসার পাততে চাইছে না। পণের টাকা যোগাতে না পেরে মেয়েদের হচ্ছে না বিয়ে। অথচ যৌবন বয়সেব বাসনা কামনা সব কিছুই দেহে আর মনে যথানিয়মে প্রবল হয়ে উঠছে। ঘরের বাঁধন শিথিল হয়েছে—পূর্ব্বেকার পরদা প্রথা নেই, অর্থনৈতিক চাপে ইস্কুল কলেজে—কর্ম্মক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মেশামেশি হয়েছে অবাধ। এর যা ফল—তাই ঘটছে। এ ছাড়া আগেকার কালের আবহাওয়াটা বদলেছে। ইংরেজ চলে গেছে—কিন্তু ওদেশের শিক্ষাটা কাঁধে চাপিয়ে গেছে আমাদেব। দেশে এখনও কেরাণী গড়ার শিক্ষাই চলছে। বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলছেন গান্ধীজী। সে আছে কাগজে কলমে। কোথাও বা কিছু কিছু বাস্তবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে তা চালু হয়নি। আর বাড়ীর শিক্ষা? হাল্কা নাচ গান—সিনেমাব নেশা—স্বামী সংগ্রহেব জন্য যা শেখা উচিত নয়—তাই খানিকটা তালিম নেওয়া, যাতে মধ্যবিত্ত সংসাব উপকৃত হবে না তাকে আয়ত্ত কবতে প্রাণপণ করা। আশ্চর্য্য আমাদের বাঙালী সংসার! এ সংসার পুরোপরি যেন বাঙালীব নয়। আগেকাব কুসংস্কাব আর হাল আমলেব ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিজ্ঞানে বিশ্বাসের নামে নাস্তিকতা—এ যেন ঘরের নয়, ঘাটেরও নয়। এমনি অবস্থায়—এই সব সঙ্কট তো ঘটবেই।

যাই হোক. মেয়েটিকে যতটা পারি সাহায্য করব এই সঙ্কল্প নিয়ে বললাম, চল চেষ্টা করে দেখি কি করতে পারি তোমার জন্য।

আপিসটা বড় রকমের। প্রকাণ্ড একটা হলে বহু লোক কাজ করছে। অত্যন্ত ঘন হয়ে বসেছে মানুষ। টেবিল, চেয়ার, র‍্যাক,

হোয়াট নট প্রভৃতির ফাঁকে ফাঁকে মানুষকে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। সবই সাজানো গোছানো, অথচ মানুষের ভিড় থেকে মানুষকে খুঁজে নেওয়া কি কঠিন।

একধারে পিতলের রেলিং ঘেরা একটা কাউণ্টার। তার মধ্যে চশমা চোখে একজন ভদ্রলোক কাজ করছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, প্রদ্যুম্ন ঘোষাল বলে কেউ কাজ করেন এখানে?

ভদ্রলোক খাতা থেকে মুখ তুলে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বল্লেন, কি নাম বললেন? প্রদ্যোত ঘোষাল?

না, প্রদ্যুম্ন ঘোষাল।

প্রদ্যুম্ন! ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এমন অদ্ভুত নাম জীবনে যেন এই প্রথম শুনচেন। যাই হোক—খানিক চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, একজন আছে প্রমোদ। তা তিনি চাটুয্যে। আর একজন আছেন প্রসাদ—তিনি তো ঘোষাল নন, ঘোষ। আর একজন আছেন প্রদীপ—

অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম ওঁর নামের ফিরিস্তি দেওয়াতে। বললাম, প্রদ্যুম্ন ঘোষাল। ছোকরা—বয়স তেইশ চব্বিশ।

ওহো নিউ রিক্রুটমেণ্টে মাস কতক হল জন কতক ছোকরা ঢুকেছে বটে। তা সে তো এ ডিপার্টমেণ্টে নয়।

বললাম, আমরা কোন ডিপার্টমেণ্ট জানি না। দয়া করে যদি সন্ধান করে দেন।

আচ্ছা আচ্ছা। ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। অমূল্য এদিকে এসো তো। ডেস্‌প্যাচ সেকসনে খবর নিয়ে বল তো কোন নতুন ছোকরা—প্রদ্যুম্ন ঘোষাল নাম…বয়স সাতাশ আটাশ—

না- না—তেইশ—চব্বিশ-

ভদ্রলোক বললেন, ও তেইশ আর তিরিশ আজকাল বোঝবার জো নেই। সবাই গোঁফ চেচে গাল কামিয়ে ক্রীম পাউডার

ঘসে—চুল পিছন দিকে ঠেলে—দিব্যি ফিটফাট থাকে—যেন কলেজ বয়।

ভদ্রলোকের নিশ্চয় ম্যানিয়া আছে—কিংবা একালের উপর বিরাগ। কি উপায়—শুনতেই হল কিছুক্ষণ একালের ছেলেদের প্রতিকূল সমালোচনা।

অমূল্য এসে বলল, প্রদ্যুম্ন বলে আছেন এক ভদ্রলোক—বছর তিনেক হল সার্ভিস। তা তিনি তো কাল থেকে ছুটি নিয়েছেন এক সপ্তাহের।

ওকে নিয়ে বোর্ডিঙে ফিরলাম। পূজোব ছুটিতে মেয়েরা কেউ দেশে গেছে--কেউ গেছে অভিভাবকের কাছে—দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে। সেই দুদিন অন্ততঃ ওকে বোর্ডিঙে রাখা চলবে।

নিজের ঘর খুলে ওকে বসালাম। ঝিকে দিয়ে তৈরী কবালাম চা। বললাম, একটু চা খাও—ক্লান্তি দূব হবে।

ও দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। ওর অন্তরে ঝড় বইছে বেশ বুঝলাম। কি উপায়ে ওকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখ ভুলো মন আমাব, তোমার নামটি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

ও মুখ তুলে বলল, আমার নাম শুভ্রা —ও নাম আমাকে মানায় না—ও নামে ডাকবেন না আমাকে। বলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ওর মাথায় একখানি হাত রেখে বললাম, কেঁদো না, শক্ত হও। পৃথিবী এমনি কঠিন জায়গা—নরম মানুষের ঠাঁই নেই। এখানে নিজের পাওনা গণ্ডা যে বুঝে নিতে না পারে তাকে কষ্ট ভোগ করতেই হয়—ঠকতে হয় পদে পদে। ভেবো না, প্রদ্যুম্নকে খুঁজে বার করবার ভার আমার। তুমি যাতে সম্মানের সঙ্গে স্থান পাও তার ঘরে—সে চেষ্টাও করব।

মেয়েটি এই কথায় মুখ তুলে চাইল। কি করুণ সরল আত্মসমর্পিত দৃষ্টি! এসব মেয়ে থাকবে সংসারের নরম ছায়ায়—মা বা শাশুড়ীর পক্ষপুট আশ্রয় করে—থাকবে স্বামীর স্বকর্তৃত্বের উপর অনন্য-নির্ভরচিত্ত হয়ে। প্রেমে—নিষ্ঠায়—সেবায় এরা সংসারকে কোমল করে, সরস করে রাখতে পারে; সংসারের কঠিন শিলাপথে পা ফেলে চলা এদের অভ্যাস নয়। দু'হাতে বাধা ঠেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার কাঠিন্যও এদের নাই। এরা লতা.জাতীয়, বৃক্ষকে আশ্রয় না করলে এদের ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। বড় মমতা হল একে দেখে।

নিজের জীবনের দূব অতীত উঁকি মেরে গেল নিমেষে। কেন আজ বোর্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে জীবন কাটাচ্ছি? আমার গৃহ বলতে এই বোর্ডিং—পরিবার বলতে ছাত্রী-মেয়ের দল। বছর ঘুরে যায়—পুরাতনরা চলে যায়, আসে নূতনের দল। যাদের মিষ্ট ব্যবহারে মনে স্নেহ-ভালবাসার নীড় রচনা সুরু হয়, ঝড়ের দোলায় আধগড়া বাসা ভেঙ্গে তারা দূবে যায় চলে।

প্রথম প্রথম শূন্য বোধ হত মন। কিছুই ভাল লাগত না, আজ দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে মনের নরম জমি ক্রমশঃ কঠিন হয়েছে—এই আসা যাওয়ার হিসাবের জমাখরচ রাখা যে ভুল তা বুঝেছি। এরা কাছে এসে হৃদয় সরস করে, ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে দেয় একঘেয়েমি—সেটি উপরি পাওনাই। তার উপর দাবী নেই, বাকী বকেয়া উশুলও চলে না।

একজনকে ভালবেসেছিলাম। তখন কলেজে পড়ি। চিঠিতে সে জানিয়েছিল ভালবাসা। জানিয়েছিল আমাকে না পেলে হয় সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করবে কিংবা ত্যাগ করবে জীবন। দুটোর কোনটাই সে করেনি। সে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অর্থ এবং যশ আর সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেছে সে। যদি সে বেছে নিত আমাকে এর

কোনটাই হয়তো পেত না। শুধু ভালবাসার উপর সংসার বেঁধে জীবনের উচ্চ আকাঙ্খা পূরণের প্রত্যাশা করে যারা– তারা শুধু স্বপ্ন-বিলাসী নয় বাস্তববোধবর্জ্জিতও বটে। একবার চিঠিতে যেন লিখেছিল সে কথা। আমিও অবশ্য আর স্বপ্ন দেখি না—এই পৃথিবীকে বহুদিক থেকে দেখার সুযোগ ঘটেছে বলেই কল্পনার রঙে ছবি আকি না আর। কিন্তু এই কচি মেয়ের দল –যারা সবে পরিচিত হচ্ছে জগতের সঙ্গে, যাদের চোখে আকাশ শুধু নীল– মনে বসন্তবায়ুমর্ম্মরিত কুঞ্জের সৌন্দর্য্যস্বাদ, তারা কেন ছবি আঁকবে না, কেন চয়ন করবে না আকাশ-কুসুম, কেন বিগলিত চিত্তে কামনার প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করবে না প্রিয়জনের? এরা বইয়ে পড়েছে—বৃদ্ধাদের মুখে শুনেছে কত প্রতারণার কথা, কত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী, কিন্তু চপল মনে সেই অভিজ্ঞতার ছাপ পাকাপাকিভাবে ধরে রাখতে পারেনি। বালুবেলায় ঢেউ এসে আকে কত রেখা, জমা করে কত বস্তু, ঢেউ মুছে দেয় রেখা সরিয়ে নেয় বস্তুকে। আগের ঢেউ যা বয়ে আনে—পরের ঢেউ তা অপহরণ করে—তার পরের ঢেউ সেই জিনিসই বয়ে আনে—ভাবে না পরবর্ত্তী ঢেউ তা গ্রাস করতে পারে। অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, কিন্তু মূল্যবোধ জাগিয়ে তরুণ মনকে সতর্ক করা যায় না।

অনেক দেখলাম। ভালবাসার ফেনিল আবর্ত্তে অনেকে ভাসল—অনেকে ডুবল; ভালবাসাকে আদর্শ করে দুঃখ বরণ করল মাত্র দু' একজন। সংসারে তারা নির্ব্বোধ কিংবা পাগল বলে পরিচিত। তাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের আছে, কিন্তু তাদের জীবনগত দুঃখ কষ্টকে শ্রদ্ধা করতে শিখিনি আমরা। ওখানে যেতে ভরসা পাইনে। এখানে বস্তু আর ব্যক্তিতে চলছে সংঘর্ষ, বস্তুর চাপে প্রায়ই দেখি ব্যক্তি পড়ছে অন্তরালে।

মেয়েটিকে যেমন করে পারি সাহায্য করব—মনে মনে স্থির করলাম।

রাত্রিতে ওকে বললাম কাছে ডেকে, নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারবে তুমি? কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে পারবে দাঁড়াতে?

প্রশ্নের ধরণে ও ভড়কে গেল। বলল, ভাল লেখাপড়া জানি না, কি কাজ করব?

কতদূর পড়েছ?

ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত।

যদি ম্যাট্রিক কিংবা আরও পড়বার সুযোগ করে দিতে পারি—পড়বে তো?

কিন্তু আপনি তো সবই জানেন—সবই তো বলেছি আপনাকে।

তার জন্যে ভেবো না—সে ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। দিন দুই তুমি বোর্ডিঙে থাক—তারপর তোমাকে নারী-কল্যাণ সঙ্ঘে পাঠিয়ে দেব। সেখানকার ব্যবস্থা চমৎকার। মেয়েরা যাতে আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। কেমন রাজী আছ?

ও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল

॥ ৬ ॥

প্রদ্যুম্নের কথা

বাত্রিশেষে সুন্দব একটি স্বপ্ন দেখলাম। উজ্জ্বল আলোয ভবা একটি প্রাঙ্গণে বহু মানুষেব আনাগোনা, একপাশে জ্বলছে হোমশিখা। হোমানলেব সামনে বসে বয়েছি আমি—গায়ে তাপ লাগছে না ধোঁযায চোখ জ্বালা কবছে না। এত মানুষেব আসা যাওয়া, একটুও কোলাহল নাই। আমাব সামনে একখানি রূপাব থালায় মল্লিকাব মালা। পাশে একটি ছোট বাটিতে সাদা চন্দন। ফুলেব গন্ধ নাই—চন্দনেবও নয়। অত্যন্ত নিঃশব্দে এসেছে জীবনেব পবম লগ্ন। তিন বিধাতাব এক বিধাতাব আশীর্ব্বাদ। কিন্তু যাকে নিয়ে এই ববমাল্য বচনা—সেই নেপথ্যচাবিণীব কোন অভিজ্ঞান কোথাও নাই! ব্যাকুল হয়ে তাকে অন্বেষণ কবছি—ঘুম ভেঙ্গে গেল।

হু-হু কবে উঠল মন।

মুখহাত ধুযে ঘবে আসতেই চা নিযে এল মাযা। বলল, দাদা, মা বললেন এ বেলা আমাদেব এখানে খাবেন।

পাছে ওঁবা দুঃখিত হন—চাযেব পেয়ালাটা টেনে নিলাম। চা পান কবতে কবতে বললাম, তোমাব মাকে বলো লক্ষ্মী—আজ এখনই আমায় বাইবে যেতে হচ্ছে—আজ ফিবতেও পাবি নাও পাবি।

কাল রাত্রিতেই প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। রঞ্জিৎকে সঙ্গে করে আমি কাটোয়া লাইনের সেই অখ্যাত গ্রামে যাব। শোভার যথাযথ সংবাদ আমায় সংগ্রহ করতেই হবে।

রঞ্জিৎ আমার প্রস্তাব শুনে বলল, একটা মেয়ের জন্য একটা রাজ্য ধ্বংস হয়েছে জানি। এ সব সে যুগের কথা। কিন্তু একটা মেয়ের জন্য একজন সামান্য মাইনের কেরাণী জীবন পণ রেখেছে—এ তোকে শুধুই দেখছি! তুই হলি কি রে!

বললাম, তোর ঠাট্টা তামাসা ভাল লাগছে না, আমি জানতে চাই শুধু—মেয়েটি নির্দ্দোষ কি না?

রঞ্জিৎকে নিয়ে নামলাম সেই হল্ট ষ্টেশনে—সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে গ্রাম। আলপথের রাস্তা—ক্রোশও ডালভাঙ্গা। চলেছে তো চলেছেই।

চলতে চলতে রঞ্জিৎ বলল, এ সাধনা ঈশ্বর লাভের চেয়েও দুষ্কর। যা পথ – তাঁকেই না লাভ করি!

ভারি তো পথ! বললাম।

মনের বাষ্প তোমায় ঠেলছে সামনে– আমি চলেছি নেহাৎ বন্ধু-প্রীতির দায়ে—একটা স্ফুলিঙ্গও আমার মধ্যে নেই।

অবশেষে গ্রামে পৌঁছলাম। সামনে এক আধ-বৃদ্ধ গোছের লোককে দেখে শোভাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

উই যে অশ্বত্থ গাছতলায় একটা মন্দির রয়েছে—ওর সামনে মাঠে যে বাড়ীখানা সেইটাই। লোকটি নির্দ্দেশ দিল।

শোভার ভাই বলল, কাকে চাই?

আপনাকে একটি কথা শুধোব কিছু মনে না করেন যদি। রঞ্জিৎ বলল।

বিলক্ষণ! তাতে মনে করাকরির কি আছে।

আমরা পাত্রী খুঁজতে বেরিয়েছি—

বটে ? তা আপনারা ?

কায়স্থ। রঞ্জিৎ নিজের পরিচয় দিল। কে একজন বলল, আপনার নাকি একটি অনূঢ়া বোন আছে –

সঙ্গে সঙ্গে যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিস্পর্শ হল। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে চীৎকার সুরু করলেন, বটে, ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি,! পরে আছতো ভদ্রলোকের মত জামা কাপড়, কথাবার্ত্তা এমন অভদ্র কেন ?

দু' পাঁচজন লোক জুটে গেল পথে। ওরই মধ্যে একজন, বর্ষীয়ান ব্যক্তি ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার প্রয়াস করল। তা ওঁব দোষ কি। তোমাব বোন যে হালে মারা গেছে তা উনি জানবেন কি করে !

শোভার ভাই গর্জ্জন করে উঠল, আমার কোন মিঞাকে জানতে বাকী নাই আর ! এখন এসেছ সালিশী করতে—এসেছ মজা মারতে ? আমার বোন মাবা যাক—কি লণ্ডনে থাকুক—তাতে তোমাদের মাথা ব্যথা কেন ?

একজন লোক বলল, মাথা থাকলেই ব্যথা। বলে সে হো হো করে হেসে উঠল।

আমরা চলেই আসছিলাম—সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডেকে বসালেন নিজের চণ্ডী-মণ্ডপে।

বললেন, আমার এখানে দয়া করে চাবটি খাবেন। ব্রাহ্মণ বাড়ী দুটি ডাল ভাত্ দেখুন, অতিথি আপনাবা, যদি উপোস করে ফিরে যান গাঁয়ের অকল্যাণ।

বললাম, আমরা তো থাকতে পারব না যে ট্রেণ প্রথমে পাব তাইতেই ফিরব।

ট্রেণ সেই বৈকালে, এখন সারা দুপুবটা তো খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করুন। আমার গরুর গাড়ী যাবে ইষ্টিশানের কাছেই—সেই গাড়ীতে যাবেন।

আচ্ছা বলতে পারেন—ভদ্রলোক বোনের কথায় অমন মারমুখী হয়ে উঠলেন কেন ?

প্রৌঢ় বললেন, ব্যথার জায়গায় হাত পড়লে অমনি হয়। কিছু-দিন আগে এই গ্রাম থেকে ছু'টি মেয়ে শহরে যায়—তারা আর ফিরে আসেনি। তাদের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর বোন তারই মধ্যে একটি মেয়ে।

আপনার কি ধারণা ?

প্রৌঢ় বললেন, ছু'টি মেয়ের সম্বন্ধে অবশ্য একই ধারণা নয়। এরই মধ্যে একটি মেয়ে—ওই ভদ্রলোকের বোন—ওর নাম ছিল শুভ্রা। সতিই শুভ্রা মেয়েটি ভারি গুণবতী মেয়ে- সে যে কোথায় গেল ! মারাই গেছে মেয়েটি না হলে তার সম্বন্ধে অন্য কথা ভাবাই যায় না। অমন সুশীলা মেয়ে আমি দেখিনি বাবা। মেয়ের শোকে ওর বাবা পর্য্যন্ত গাঁ ছেড়েছেন - পাঁচ মাস হ'ল আজও তিনি ফেরেননি হাওয়া বদল করে।

অন্য মেয়েটি ? রঞ্জিৎ প্রশ্ন করল।

বলবেন না মশাই। ঘৃণায় ভদ্রলোকের নাক চোখ কুঞ্চিত হল। সে নাকি বায়স্কোপে পার্ট করছে। তার একটা ছবি বেরিয়েছে কলকাতায় কোন ছবিঘরে, গাঁয়ের ছু'জন ছেলে দেখে এসে বলাবলি করছিল সেদিন। ছ্যা !

রঞ্জিৎকে বললাম, আর কেন কৌতূহল দমন কর। ভদ্রলোককে বললাম, একটা কথা জানেন কি ? ওই যে মেয়েটীর বাবা চেঞ্জে গেছেন বললেন না, তাঁর ঠিকানাটা জানেন কি ?

হুঁ, জানি। ক'দিন আগেও রাজগীর থেকে যেন তাঁর চিঠি এসেছে। বলে নাম ঠিকানা বলে দিলেন।

পথে এসে রঞ্জিৎ বলল, ব্যাপার কি। রাজগীর ধাওয়া করবে নাকি ?

বললাম, না, সেই স্কাউনড্রেলটাকে একবাব দেখব, তোমাব বাড়ীব সামনেব সেই পাজীটাকে।

বঞ্জিৎ হেসে বলল, ক্রোধ তোমাব মিছে। দোষী শুধু সেই নয়।

কোন কথা বললাম না, সাবাপথ ভাবতে ভাবতে চললাম। কোথায় গেল শোভা কোথায পাব তাব সন্ধান? শুনেছি ভালবাসলে মানুষ উদাব হয। আবাব ভালবাসা সঙ্কীর্ণ কবে মনকে। সন্দেহ এই সঙ্কীর্ণ ভালবাসা থেকে জন্মায। আমি কি সন্দেহ কবছি শোভাকে? সে আব কাউকে ভালবাসবে এই সন্দেহ? এবই বশে পূর্ব্বাপব বিচাব না কবে তাকে ঠেলে দিযেছি অজানা পথে সর্ব্বনাশেব মুখে।

বঞ্জিৎ বলল, একটা কথা জিগ্‌গেস কবি, এখনও সেই মেযেটাকে ভালবাসিস কি?

জানি না।

নিশ্চয ভালবাসিস—না হলে তাব সব কথা জানবাব জন্য এত দূবে ছুটে এলি কেন?

পাহাড থেকে নেমে এল নদী—হুডমুড কবে নেমে এল। তবঙ্গে গর্জ্জনে বেগে পাষাণ অববোধ ভেঙ্গে নেমে এল নদী। পবিপূর্ণ হল দিক্, পবিপ্লাবিত হল ধবাতল। দু'হাতে মুখ ঢাকলাম—থব থব কবে কেঁপে উঠল দেহ।

বঞ্জিৎ আমাব কাঁধে একখানি হাত বেখে বলল, তোব জন্য দেখছি গোযেন্দা সাজতে হবে। দূব বোকা—হাতে পেযে ছেডে দিলি নিধি।

চাব পাঁচদিন ধবে তন্ন তন্ন কবে ঢুঁডলাম শহব—শোভাব চিহ্নমাত্র পেলাম না।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। এ দিকের খোঁজাখুঁজি তো শেষ হল, ছুটিও ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েকদিন পরে আপিস গিয়ে সেই গতানুগতিক কর্ম্মধারায় সঁপে দিতে হবে নিজেকে। কি যে একঘেয়েমি, দিনে দিনে স্থূল হাস্যপরিহাসের তালে গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলা ! এমনি চলতে চলতে হয়তো একদিন সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাব শোভাকে, ভুলব আজকের হৃদয়-বেদনা। একান্ত বশম্বদ সন্তানের কর্ত্তব্যপালন করতে আর একটি নিরীহ বালিকার পাণিপীড়ন করে সংসার বাঁধব সেই দূর পাড়াগাঁয়ে ; সুখী হবেন বাবা মা। শনিবারের আগে ফর্দ্দ মিলিয়ে জিনিস কিনব কলকাতার বাজার থেকে, প্রতি শনিবারে বড় বড় পুঁটুলি বেঁধে গলদঘর্ম্ম হয়ে ছুটব রেল ষ্টেশনে। কিউ দিয়ে কিনব টিকিট। ঘামে ভিজে পাঞ্জাবীটা লেপ্‌টে যাবে গায়ে, এবং দেহভরা অস্বস্তি নিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসব গাড়ীর বেঞ্চিতে। ভিড়ের চাপে—বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায়—ফুটবল, সিনেমা, রাজনীতি, সমাজনীতির উগ্র তর্ক-বাসরে ঘণ্টা দু'তিন নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব করে এক সময়ে গিয়ে পড়ব গন্তব্যস্থানে। ষ্টেশন থেকে বাড়ী সে পথও বড় কম নয়। পদযান কিংবা অশ্বযান যাতে করেই হোক বাড়ীর দুয়োরে পৌঁছব যখন—তখন ক্লান্তিতে আলস্যে ভেঙ্গে পড়বে দেহ। এবং সেই প্রকার ক্লান্তি আলস্য নিয়ে সোমবারে ফিরব আপিসে। এর মধ্যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাঁধাধরা আলোচনা। কারণ আলোচনাকে সময় হারানো শূন্যে টেনে নিয়ে যাবার উদ্যম উভয় পক্ষের নিঃশেষিত। প্রিয়ার সঙ্গে সংসার আর সিনেমার কোন গল্প, একটু বা বিলাস, জীবনের পাত্রে স্বাস্থ্যহীন ভোজ্য—না, না, এই একঘেয়েমির কোলে নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ করতে পারব না। এ যে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে আনা। যখনই এই চিত্র বর্ণসম্পাত করে চিত্তে—আমাদের কবি এসে দাঁড়ান সামনে ঃ

লাভ ক্ষতি টানাটানি কলহ সংশয়
ভগ্ন-অংশ ভাগ···সহেনা সহেনা আর
জীবনেরে দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে ক্ষয়।

শোভাকে আমার চাই—যে কোন মূল্যে—যেমন করে হোক!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, শোভা তো তার বাবার কাছে যায় নি? সেখানে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েক মাস ধরে আছেন।

যেদিন শোভাদের গ্রাম থেকে ফিরি—শোভার বাপের প্রবাসের ঠিকানাটা নোট বুকে টুকে নিয়েছিলাম। শোভা কি জানে না—কোনখানে গেলে সব চেয়ে বেশী উপকার পাবেন?

একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা, উষ্ণ প্রস্রবণের জলে দু'বেলা স্নান করলে নাকি পক্ষাঘাতও সেরে যায়?

বলেছিলাম, আশ্চর্য্য কি।

ও বলেছিল, অথচ অনেকের মুখে শুনেছি—ওই রকম গরম জলে নেয়ে নেয়ে তাঁদের বাতের ব্যথা সেরে গেছে। ভারি আশ্চর্য্য নয় কি?

একটু থেমে বলেছিল, রাজগীর নাকি তেমনি একটি জায়গা—যেখানে শীতকালে নানান দেশের মানুষ আসে অসুখ সারাতে।

রাজগীর? নামটা নতুন মনে হয়েছিল।

কেন—পড়েননি মহাভারতে? ওর প্রাচীন নাম গিরিব্রজপুর। জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। পাহাড়ে ঘেরা দেশ, চমৎকার জায়গা। ওখানে একটা পাহাড়ের গা দিয়ে অনবরত গরম জল পড়ছে। সেই জলে স্নান করতে পারলে মানুষ নীরোগ হয়।

রাজগীর সম্বন্ধে এত যার আগ্রহ এবং এত সংগ্রহ—সে কি একবার যাবে না সেখানে?

নোট বই খুলে ঠিকানাটা মিলিয়ে নিলাম। শোভার বাবা ওইখানেই গেছেন। বেশী দূরে নয়—বিহারের মধ্যে জায়গাটা পড়ে। বখতিয়ারপুরে গাড়ী বদল করে ছোট লাইনের গাড়ী ধরতে হয়। একটি রাত্রির ভ্রমণ।

পুরাণের গিরিব্রজপুর—বৌদ্ধযুগে হয়েছিল রাজগৃহ। ভগবান তথাগত এক সময়ে এই রাজগৃহের একটি পর্ব্বতগুহায় বসে উপদেশ বিতরণ করেছিলেন শিষ্যবৃন্দকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—ওই একই সময়ে জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীরও আর একটি পর্ব্বতগুহা থেকে করেছিলেন ধর্ম্ম প্রচার। এরই নিকটে আছে সেকালের বিখ্যাত আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। সেখানে দশ হাজার যতি শ্রমণ জ্ঞানান্বেষণপরায়ণ ছাত্রদল একই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা করতেন—বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং যার বর্ণনায় শতমুখ।

জলে-ডুবে-যাওয়া মানুষ যেমন এক গাছি তৃণ পেলে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে তেমনি শোভার সন্ধানে এসে পৌঁছলাম রাজগীরে। ষ্টেশনের নাম রাজগীর কুণ্ড। উষ্ণ প্রস্রবণের গুণেই দেশটা আজও সজীব। না হলে জরাসন্ধের গিরিব্রজপুব আর বৌদ্ধযুগের রাজগৃহ—পাঁচটি পাহাড়ের অলঙ্কার গায়ে চাপিয়েও বন জঙ্গলে ঢেকে মুছে আসছিল মানুষের মন থেকে। বন জঙ্গল এখনও আছে, পথ ভালমত গড়ে ওঠেনি যদিও স্বাস্থ্যকামীরা এখানে ওখানে বাসা বেঁধে এই অজ পাড়াগাঁখানিকে শহরের কৌলিন্য দান করবার ব্রত নিয়েছেন।

ঠিক দুপুর বেলায় পৌঁছলাম ষ্টেশনে। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ ভরা ছোট ষ্টেশন। যাত্রী যা নামল—তাতে ষ্টেশন ভরে গেল, কিন্তু ষ্টেশনের বাইরে মাত্র তিনচারখানি গো-যান। অন্য যান কেন নাই—এটি পরে জেনেছি। যান চলাচলের মত রাস্তা কোথায়? আর কতটুকুই বা গ্রাম? এক মাইলের মধ্যে যা কিছু। ষ্টেশনের ধারের

রাস্তাটা পিচ বাঁধানো—এবং ওটি এই গ্রামের সবে ধন নীলমণি। আর সব কাঁচা রাস্তা—উঁচুনীচু—আঁকাবাঁকা—এবং হাঁটুভোব ধূলোয় ভর্ত্তি। স্টেশনের সামনে কয়েকটি আম আর বট অশ্বত্থের গাছ চোখে পড়ল—দেখলাম মাঠ-ভর্ত্তি খেজুর গাছ। মাঠে বনকুলের গাছ—বাকসের ঝোপ—কোন মাঠ ভরে ফুটেছে অড়হড়ের হলদে ফুল। পাহাড় বাদ দিয়ে অনায়াসে বাংলা দেশকে কল্পনা কবা চলে। রাস্তাব ধাবে বয়েছে চায়ের দোকান খাবারের দোকান। পৌরশাসন ব্যবস্থা আছে কিনা জানিনা—তবে পথের ধারে কয়েকটি কেবোসিন আালোর খুঁটি চোখে পড়ল। এই টিম-টিমে আলো নিশ্চয় অন্ধকার নাশ কবে না, পথের নিশানা জানিয়ে দেয় রাত্রিকালে।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্তি বোধ করছিলাম, বসলাম গিয়ে একটি চায়েব দোকানে।

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম দোকানীকে, এখানে থাকবাব ব্যবস্থা আছে? হোটেল কিংবা ধর্ম্মশালা?

দোকানী বলল, না বাবু—হোটেল নেই। জৈনদের তুটো বড় ধর্ম্মশালা আছে, সিতাম্বর আর দিগম্বর ধর্ম্মশালা। কিন্তু চিঠি না দেখালে ওখানে থাকতে দেবে না। আর একটি ধর্ম্মশালা আছে—মহাবীর ধর্ম্মশালা, কিন্তু ওখানে কি জায়গা পাবেন? এতক্ষণে যাত্রী ভর্ত্তি হয়ে গেল হয়তো।

তাহলে থাকবে কোথায়?

কেন, বর্ম্মী মন্দিরে যান না, ওবা কেরায়া দিয়ে তু'চাবদিন থাকতে দেয়। এছাড়া অনেক ঘর কেরায়া পাওয়া যায়।

প্রথমে গেলাম মহাবীব ধর্ম্মশালায়। মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু পথ—তুধারে বুনো গাছের ঝোপ। মাঠ পেরিয়ে পেলাম অসমতল পথ—ধূলো ভর্ত্তি। চলতে গেলে সে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে আসে। পথের ধারে অনেক বাড়ীঘর। কোঠাবাড়ী এবং ফ্যাসানওয়ালা

বাড়ী। এই গ্রাম্যপথের ধারে ওগুলি যেন অনিমন্ত্রিতের দল। এদেশের বাড়ীগুলিতে সৌষ্ঠব নাই। আকণ্ঠ যাত্রী বোঝায়ের ব্যবস্থাটা সুচারু ভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

ধর্ম্মশালায় স্থানাভাব। অগত্যা বর্ম্মী মন্দিরে ফিরে এলাম। পিচবাঁধানো রাস্তার ধারে উঁচু জমির উপরে চমৎকার বাড়ী। সামনে পথ আর মাঠ, পিছনে পাহাড়। কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে এখানে জায়গা মিললো।

বিশ্রাম করতে করতে ভাবলাম, গ্রাম ছোট, তবু শোভাব বাপের সন্ধান পাব কেমন করে। সবাই তো দেখছি ভিন্‌দেশী মানুষ—দুচার দিনের অতিথি। তাঁরা কেমন করে বলবেন—কোথায় বাসা নিয়েছেন বাংলা দেশের অখ্যাত এক গ্রামের—অখ্যাত এক সন্তান—মতিলাল বাবু।

শুধোলাম দু' একজনকে। তারা মাথা নাড়ল, জানে না। একজন শুধু বলল, এখানে যদি চেনা মানুষ খুঁজে নেবার চেষ্টা করেন—সোজা চলে যান কুণ্ডের ধারে। সকালে বিকেলে সব রকমের মানুষ এসে জমে ওখানে। চান করতে, বেড়াতে, গল্প করতে—একবেলা না-একবেলা মানুষ আসবেই ওখানে।

দুপুরের রোদ নরম হলে পথে বেরিয়ে পড়লাম। যে পথটা পাহাড় বাঁয়ে রেখে সোজা চলে গেছে কুণ্ডের দিকে—সেই পথ ধরলাম। ডানধারে পড়ল বিস্তীর্ণ মাঠ, একটা ঝাঁকড়া বটগাছ, তার একটু দূরে সারি সারি তাঁবু পড়েছে। একটি দুটি নয়—দু' পাঁচশো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম - ওটি স্কাউটদের তাঁবু। পূজোর সময় আর শীতকালে—খ্রীস্টের জন্মদিনে নানান দেশ থেকে দলে দলে আসে স্কাউট ছেলেরা। এমন খোলা-মেলা মাঠ, পাঁচ পাহাড়ের পাঁচীল—চারধারে ছড়ানো পৌরাণিক যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত কাহিনী ও কথা। বর্ত্তমান ভারতের সামনে এসে দাঁড়ায় অতীত

কালেব ভারত, যুগযুগান্তব ধবে চলে আসছে যে সংস্কৃতিব ধাবা—তাব মৃদু সুরটি উষ্ণ জলধারার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশে আশ্চর্য্যভাবে নাড়া দেয় বস্তুবাহী মনকে। চলতে চলতে দু'ধাবে পড়ল কত না চিহ্ন। ছোট ছোট শিলাসঞ্চিত স্তূপে উৎকীর্ণ রয়েছে অজাতশত্রুর নাম। এইখানে ছিল তাঁব প্রাসাদ। একটু দূবে দেবদত্তেব পাষাণসৌধ। কে এই দেবদত্ত? ছেলেবেলায় ইতিহাসেব বইতে যাঁব হাঁস মাবাব গল্প পড়েছি— যে ঘটনায় করুণাঘন চিত্তেব প্রথম বিকাশ লাভ ঘটল!

পাশের এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবলাম, কে এই দেবদত্ত? ইনি কি বুদ্ধেব খুড়তুতো ভাই?

বৃদ্ধ ঈষৎ হেসে বললেন, তা হবে। কিন্তু ইনিই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছিলেন তথাগতেব বিরুদ্ধে।

সেকি— খুব·আশ্চর্য্যেব কথা তো! বুদ্ধদেবেব কোন শত্রু ছিল বলে তো -

শোনেন নি? আড়াই হাজাব বছবে তাঁর মৈত্রীভাবনাব বাণী সবকিছুকে মুছে দিয়ে স্পষ্ট হযে উঠেছে। কিন্তু সেদিনও প্রতিপক্ষেব অভাব ছিল না। তথাগতেব মহাপবিনির্ব্বাণেব বহস্যটা জানেন? জানেন না? এখন বিষাক্ত ছত্রাক ভক্ষণেব গল্পটাই প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু সেই বিষক্রিয়া নষ্ট কববাব জন্য সেকালে তক্ষশীলা থেকে সুদক্ষ বৈদ্য আনাতে হয়েছিল – সে খবব বাখেন? যাই হোক এই দেবদত্ত যে বিদ্রোহ ঘোষণা কবেছিলেন তা ধর্ম্মবিষয়ক কয়েকটি নীতি নিয়ে। জানেন তো সে গল্প।

বেশতো –বলুন না। কিন্তু বাঁ ধাবেব ওই পাহাড়টাব নাম কি? যেটাব উপব দেবদত্তেব পাষাণপুবী ছিল?

ওটাব নাম বিপুল পাহাড়। ওই দেখুন পাহাড়েব গায়ে ছোটমত একটা মন্দিব দেখা যাচ্ছে—ওটি দিগম্বর জৈন মন্দিব। সামনেব দুটো

পাহাড়েও জৈনমন্দির দেখুন। সিতাম্বর আর দিগম্বর জৈনদের তীর্থভূমি এই রাজগৃহ।

ডাইনের পাহাড়ের গায়ে সূর্য্য হেলেছেন—অস্তাচল পথের পথিক সূর্য্য। ওর নাম বৈভব গিরি। ওই পাহাড়টার মাঝখানেই উষ্ণ জলের কুণ্ড। সিঁড়িটা পাহাড়ের গায়ে বেঁকে বেঁকে উঠেছে—দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। তার একটু আগে—ডানধারের কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা আর একটি জায়গা পড়ল। এগিয়ে গিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়লাম। রাজগৃহে যে বেণুকুঞ্জে বিশ্রাম করতেন তথাগত আর যেখানে তাঁকে ঘিরে কথামৃত পান করত অসংখ্য দুঃখতাপপীড়িত নরনারী—এ সেই পুণ্যভূমি। আর তারই মাঝখানে রয়েছে সে যুগের কলন্দক দীঘি। ওটির সংস্কার হচ্ছে।

বৃদ্ধ বললেন, শুধু রাজগীর নয়—রাজগীর থেকে নালন্দা পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ইতিহাস বার করা হচ্ছে। দুধারে পাহাড় রেখে যদি এগিয়ে যান আরও—দেখবেন জরাসন্ধের দুর্গতোরণ—বৈভর পাহাড়ের ওপর তার মন্ত্রণাভবন। আবার নেমে আসুন ; একটু সামনে চললেই পড়বে ছোট ছোট নদী—তার পাশে শ্মশান। আরও এগুলে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির-সীমানার চিহ্ন পেয়ে যাবেন। তার পরেও যদি মাইল খানেক এগিয়ে যান পাবেন মনিয়ার মঠ। ওটি মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। ওখানে নাকি সর্পপূজা হতো—নালন্দার যাদুঘরে দেখবেন তার সাজ-সরঞ্জাম। মঠ ডাইনে রেখে এগিয়ে যান—পাবেন গৃধ্রকূট পাহাড়—ওই পাহাড়ের এক গুহায় বসে উপদেশ বিতরণ করতেন তথাগত।

তথাগতের কথা আসতেই দেবদত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধের প্রসঙ্গটা স্মরণ হল। বললাম, কিন্তু বললেন না তো তথাগতের সঙ্গে দেবদত্তের বিরোধ বাধল কেন ?

ওহো—বলিনি বুঝি গল্পটা ? বুড়ো বয়সের দোষই এই—এক

কথা থেকে আর এক কথা এসে পড়ে। গল্প বলছি বলে কিছু মনে করলেন না তো! বলছি এইজন্য যে এটা বুদ্ধের অনুরাগীরা মহিমা বাড়াতে হয়তো বা রচনা করে গেছেন। অবশ্য নীতিগত যে বিরোধ সেটা গল্প নয়—গালগল্প তৈরী হয়েছে তারপরে—বিরোধটা পেকে উঠলে।

হাঁটতে হাঁটতে কুণ্ডের নীচেয় পৌঁছলাম। বৃদ্ধ বললেন, আসুন—ওই পোলটার ধারে পাথরটাতে একটু বসি, বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি।

গোটা ত্রিশেক সিঁড়ি ভেঙ্গে পুল পার হয়ে একখানা চৌকো পাথরের উপরে পাশপাশি বসলাম দু'জনে। আবও শ'খানেক সিঁড়ি ভাঙ্গলে তবে কুণ্ডেব দবজায় পৌঁছব। এ জায়গাটা বেশ লাগছে।

ডানধাবে ফাঁকা জমি—একটু গিয়েই চওড়া বাস্তা—সরু হয়ে ঢুকেছে বাঁশবনেব মধ্যে। তাবপব পাহাড়েব পাঁচীল। পিছনে পাহাড়, সামনেও পাহাড়। বাঁ দিকে দোকানপসাব বাড়ীঘব কিছু—আর কাঁটা তার দিয়ে ঘেবা খানিকটা জমি। ওরই পাশে পাশে চলেছে শহরের পীচ বাঁধানো বাস্তা।

কুণ্ডেব জল পুলেব নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে পাথবে পাথবে ধাক্কা লেগে কল কল শব্দ হচ্ছে—বাংলা দেশ হলে বলা চলত নূপুব বাজিয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী। সমতল বালু আঙ্গিনায় নাতিপ্রখব স্রোতধারা নূপুব বাজিয়েই চলে—উপলখণ্ডেব উপবে বাজে ঝাঁজব মল।

ঝমব ঝমব মলেব তালে বৃদ্ধ গল্প বলে চললেনঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনের জন্য দেবদত্ত নাকি পাঁচটি প্রস্তাব কবেছিলেন বুদ্ধদেবেব কাছে। এগুলি সন্ন্যাসীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় হোক—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। যেমন—আজীবন অবণ্যবাস, আমিষ আহার ত্যাগ, ভিক্ষান্নে জীবন ধাবণ, পুবাতন ও ছিন্নবস্ত্র পবিধান আব সর্ব্বদা

বৃক্ষতলে বাস। তথাগত জানিয়েছিলেন, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এগুলিকে তিনি বাধ্যতামূলক করতে চান না। আর বর্ষাকালে গাছতলায় বাস তিনি অনুমোদন করেন না। মতে যখন মিলল না—দেবদত্ত সঙ্ঘ ত্যাগ করলেন ও বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন। সম্রাট অজাতশত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করে দেবদত্ত শত্রুতাচরণ করেন—কিন্তু দৈব প্রভাবে তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেন নি।

শেষ হল ওঁর গল্প। সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে পাহাড়ের আড়ালে—চারিদিকে পাতলা অন্ধকার নেমে আসছে। রহস্যপুরীর মত বোধ হচ্ছে পাষাণ-রাজ্যকে। কত লোক সিঁড়ি বেয়ে নামছে আর উঠছে। যাঁর সন্ধানে আমার অজানা দেশে আগমন তাঁকে তখনও খুঁজে পাইনি। খুঁজে পাব কিনা জানি না। ব্যাকুল হয়ে উঠল মন—নিসর্গ দৃশ্য থেকে ফিরে এলো বস্তুজগতে।

বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কতদিন আছেন এখানে?

এই কথা! বৃদ্ধ হেসে উঠলেন হো হো করে। এতো অতি সাদা কথা। এতে মনে করা-করির কি আছে। আমাদের কালে এটুকু জিজ্ঞাসা করতে কেউ সঙ্কোচ বোধ করত না। আমরা অনায়াসে অপরিচিতের নাম শুধিয়েছি, তার বাবার নাম, পেশা আর মাইনের কথা শুধিয়েছি। ওটাই ছিল তখনকার দিনে আলাপ জমানোর রীতি। যাক। আছি তো এখানে বছর পাঁচ ছয় হল—একটা ছোটমত কুঁড়ে ঘর বানিয়েছি—কিনা বন্ধনে জড়িয়েছি।

তাহলে এখানকার সকলকেই তো চেনেন আপনি। আগ্রহভরে শুধোলাম।

সকলকে না হলেও প্রায় সবাইকে চিনি। গ্রামটা বড় নয়, বেড়াবার জায়গাও এই একটা। যাঁরা বেশীদিন রয়েছেন—তাঁদের

চিনি বৈকি। যারা দু'একদিনের জন্য আসে, চটপট পাহাড়ে ওঠে—তাড়াতাড়ি কুণ্ডে স্নান করে, একদিনেই গৃধ্রকূটে ওঠে আর মনিয়ার মঠ দেখা শেষ করে, নালন্দায় পাড়ি দেয়—তারপর ট্রেণে চেপে হুস করে পালিয়ে যায় তাদের অবশ্য চিনি না।

না, না, তাদের কথা বলছি না। যাঁরা হাওয়া বদল করতে এসে কিছুদিন থাকেন—

এই অগতির গতি কুণ্ড ছাড়া গতি কোথায় তাঁদের বলুন? সকালে একবার তো আসেনই—বিকেলেও আসেন। তা কার সন্ধান চান আপনি?

ইতস্ততঃ করে বললাম, নামটা তাঁর ঠিকমত মনে পড়ছে না। বুড়ো মতো লোক, বাতে পঙ্গু—সঙ্গে দুটি মেয়ে।

বৃদ্ধ সোৎসাহে বললেন, মতিবাবুর কথা বলছেন কি? ভদ্রলোক পাঁচ ছ'মাস হল এসেছেন—বেশ ইমপ্রুভ করেছেন এখন। প্রথম প্রথম নাইতে আসতেন ডুলি করে, এখন পায়ে হেঁটেই আসেন। আপনার আত্মীয় হন বুঝি?

আত্মীয়? না, হাঁ, বাংলাদেশের মানুষ তো, ঠিক চেনা না হোক—

বৃদ্ধ হাসলেন, তা বিদেশে—স্বজন না হোক—স্বজাতি মাত্রই ভারি আপনার। কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ উনি। বলেন, স্বজন কিংবা স্বজাতি—দুই-ই—সময় বিশেষে পরম শত্রু হয়। তারা যেমন আঘাত দিতে পারে—পরম শত্রুও তা পারে না।

কেন একথা বলেন তিনি? শুধোলাম।

নিশ্চয় কোন আঘাত টাঘাত পেয়েছেন—তাই। কি বলেন?

উনি উল্‌টে প্রশ্ন করায় চমকে উঠলাম। উনি যদি শোভার বাবা হন—তাহলে আঘাতের গুরুত্বটা অস্বীকার করি কেমন করে! আরও কিছু খবর জানার কৌতূহল প্রবল হল, কিন্তু ভদ্রতা আর

শালীনতাবোধের সহিষ্ণুতা দিয়ে উগ্র আগ্রহকে দমন করলাম। যেটুকু শুনলাম, যথেষ্ট। বুঝলাম, আঘাত পেয়ে পালিয়ে এসেছেন এবং ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত হয়তো এইখানেই থাকবেন।

বললাম, নমস্কার, আজ উঠি।

বললেন, দেখা করবেন না মতিবাবুর সঙ্গে? চলুন, চলুন, যাবার পথেই ওঁর বাড়ী পড়বে। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন।

যাব কি যাব না ইতস্ততঃ করবার অবসর কোথায়! ওঁকে অনুসরণ করে মতিবাবুর বাসায় পৌঁছিলাম।

দু'খানি ছোটমত ঘর নিয়ে থাকেন মতিবাবু। ছোট পরিবার, স্ত্রী আর একটি মেয়ে। মাস দুই হল কাজ নিয়েছেন একটা মহাজনের ফার্ম্মে। কাজ এমন কিছু নয়—মাল চালানের রসিদ লেখা, মাল ডেলিভারি নেয়া, বুক করা, হিসাব রাখা আর খরচের টাকা খাতায় তোলা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজী চিঠি লিখতে হয়। উপার্জ্জন যৎসামান্য, কিন্তু বিদেশে এই যথেষ্ট। ঘরভাড়া দিয়ে যা কিছু বাঁচে চাল আর দুধের খরচটা তো চলে যায়।

পথ চলতে চলতে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করলাম বৃদ্ধের কাছে।

সন্দেহ রয়ে গেল মনে। সঙ্গে রয়েছে একটি মাত্র মেয়ে, আর কেউ আসেনি। মেয়েটির বয়স কত? সে কি নিতান্তই ছোট? বালিকা, না তরুণী?

আমায় দেখে মতিবাবু বললেন, তোমায় তো চিনতে পারলাম না বাবা?

আজ্ঞে—আপনার নাম শুনেছি—

কার মুখে শুনলে আমার নাম?

উনি যে জেরা করবেন—ভাবিনি। আমতা আমতা করে জবাব দিলাম, আপনাদের গাঁয়ে কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম কি না, তাই—

মতিবাবুর মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল—অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন উনি। হঠাৎ ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চড়া গলায় ডাকলেন, ওরে শীলা, চা এখনও হল না রে? বলতে বলতে তাড়াতাড়ি উঠে ভিতরে চলে গেলেন।

আমরা দু'জনে অবাক হয়ে চাইলাম বারান্দার পানে।

বৃদ্ধ গলা নামিয়ে বললেন, দেখুন, দেশের কথা ওঁকে আর শোনাবেন না। উনি ভারি কষ্ট পান ওতে।

মূঢ়ের মত বললাম, কেন?

সব কেন নাই বা জানলেন। আপনারা তরুণ, সংসারের পথটা বেশ সোজা আর আরামের এই ধারণা আপনাদের। একটু বয়স বাড়লে বুঝবেন—এ পথে শুধু আলো নেই, শুধু ফুল ফোটে না, শুধু হাসি আনন্দ গল্প করে পথ চলার সৌভাগ্য সকলের হয় না। এর অন্য দিকটাও আছে। এবং সেইটিই বেশীর ভাগ মানুষের ভাগ্যে জোটে।

কোন সংশয় রইল না—ইনিই শোভার বাবা। কিন্তু শোভা গেল কোথায়? শোভা সম্বন্ধে ওঁর মনোভাবটা বা কি?

ফিরে এলেন মতিবাবু। দু'হাতে দু'টি কাপে চা নিয়ে পিছু পিছু এল একটি কিশোরী মেয়ে। অত্যন্ত কুণ্ঠিত পায়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। সামনে টেবিল বা টুল ছিল না যে তার উপর রাখবে পেয়ালা—দাঁড়িয়েই রইল সে।

মতিবাবু বললেন, একটু চা—

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলে নিলাম, চাইলাম মেয়েটির দিকে। কৌতূহলী অবাধ্য দৃষ্টি ভদ্রতাবোধ মানল না—মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ পরিমার্জ্জনা করে ফিরে এল চায়ের কাপে। সরম-কুণ্ঠিত নতমুখী মেয়ে, রং ময়লা, মুখের আদলও শোভার মত নয়, কিন্তু চোখ দুটি হুবহু তার মত। তেমনি ভাসন্ত,

টানা টানা আর যুগ্ম ভ্রূর মাঝখানে আধবোজা ভীরু দুটি কমল-কোরক।

মতিবাবু বললেন, চা খেয়ে নিন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম।

মতিবাবু বললেন, দেশ কি আপনার আমাদের পাশের গ্রামেই? কোন আত্মীয় বাড়ী গিছলেন বুঝি?

নিজে থেকে গ্রামের প্রশ্ন তুলছেন দেখে আমরা পরস্পর আর একবার অবাক হয়ে পরস্পরের পানে চাইলাম।

উনি বললেন, আমাদের সম্বন্ধে গ্রামে অনেক কথাই শুনে থাকবেন—

তাড়াতাড়ি বললাম, আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলাম ওখানে।

ও। খানিক চুপ করে কি যেন ভাবলেন। পরে আমার সঙ্গী বৃদ্ধকে উদ্দেশ করে বললেন, জানেন পশুপতিবাবু, মানুষ চায় মানুষের সঙ্গ—সঙ্গী কি পড়সী না হলে আমাদের চলে না, অথচ পরস্পরকে আঘাত দিয়ে আমরা কম আনন্দ পাই না।

পশুপতিবাবু হাসলেন। বললেন, সব মানুষের স্বভাব এক নয়।

নয়? মতিবাবু যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কণ্ঠে জোর দিয়ে বললেন, আমি বলব—কম বেশী সব মানুষের মধ্যে আছে সৎ মানুষ আর অসৎ মানুষ। ঠিক সৎ বা অসৎ নয়, মানে মানুষের দুঃখ দেখে যে মানুষ কাঁদে—সেই মানুষই মানুষকে দুঃখ দিয়েও তৃপ্তি পায়। যেমন ধরুন, আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী—ভালবাসি পরস্পরকে—এক জনকে না হলে অন্য জনের একমুহূর্ত্তও চলে না, কিন্তু আমার সংসারে যখনই কোন কলঙ্কের কানাঘুষা উঠবে—আপনার সংসারে তখনই তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হবে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে শাসক, আছে পীড়ক, আছে মাষ্টার মশাই।

এঁরা মানুষের বাইরের ত্রুটিটাই বিশেষ করে দেখেন, ভিতরের· কার্য্যকারণের সূত্র মিলিয়ে দেখতে চান না।

তিনি চুপ করলেন—চারদিকে কেমন যেন থমথমানি ভাব জমে উঠল। শুক্লপক্ষ ঘেঁষা কি একটা তিথি ছিল—আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে—তার ম্লান আলোয় পাহাড়টা পর্য্যন্ত ছল ছল করছে। একটা কিছু না বললে মনটা কেমন যেন ভার ভার হয়ে উঠছে।

অবশেষে পশুপতিবাবু বললেন, বুঝেছি—কোন কারণে মনের সাম্য হারিয়েছেন। আসলে এই দিক দিয়ে মানুষকে কোনদিন ভেবে দেখিনি আমি। এমনও তো হতে পারে– যিনি শাসক বা মাষ্টার মশাই -তিনি চান সকল মানুষই নিজে হোক পবিত্র—সমাজকে রাখুক পবিত্র। একটি সুস্থ প্রতিবেশ গড়ে তুলতে চান ওঁরা– যার মধ্যে সবাই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে।

মতিবাবু হাসলেন, তা বটে। সেই চাওয়াটাই কোন কোন ক্ষেত্রে পীড়ন হয়ে দাঁড়ায়।

পশুপতিবাবু বললেন, যা কল্যাণকব ব্যবস্থা—তা পীড়ন হবে কেন? আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাথা নীচু করে একমুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলেন মতিবাবু। একবাব চাইলেন আমার পানে, হয়তো একটু দ্বিধা জাগল। তারপর নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, ধরুন আপনার বংশের একটি মেয়েকে নিয়ে কথা উঠল। মেয়েটি সত্য দোষী কি না—সে বিচার হোল না, অথচ তার কলঙ্কে দেশ ভরে উঠল। অতঃপর সেই কন্যাকে ত্যাগ কবাব বিধান যদি দেন কোন হিতৈষী বন্ধু—তিনি কি পীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করলেন না তখন—তাঁর সমাজ-হিতৈষিণা থাকা সত্ত্বেও?

পশুপতিবাবু বললেন, আমি যদি মেয়ের বাবা হই, এবং মেয়ের উপর স্নেহ থাকে —

কোন্ পিতা মেয়েকে ভালবাসেন না—কোন্ পিতার মনে আঘাত লাগে না তার দুর্নামে? ধরা গলায় বললেন মতিবাবু। তবু আশ্চর্য্য, উপদেশ দেবার সময় আমরা মেয়ের পানে চাই না, পিতার আসনও নিই না—শুধু এইটুকুই হয়তো কামনা করি—চার পাশের হাওয়াটা নির্ম্মল থাকুক। নয় কি? বলে হাসলেন মতিবাবু।

কি সে হাসি! যেন দমকা একটা হাওয়া লেগে শিথিল-বৃন্ত একরাশ কামিনী ফুল ঝর্‌ঝর্ করে ঝরে পড়ল মাটিতে।

পশুপতিবাবু ওঁর মনোবেদনা বুঝে প্রসঙ্গটা বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন।

আচ্ছা রাত হয়ে গেল, উঠি।

যাবেন? বেশ। একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে। আমার পানে চাইলেন মতিবাবু। ক'দিন আছেন এখানে?

কালই হয়তো চলে যাব। বললাম।

কাল! ভাল লাগছেনা বুঝি জায়গাটা?

পশুপতিবাবু ততক্ষণে বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমায় উদ্দেশ ক'রে বললেন, প্রত্যুম্নবাবু, আমি এগুচ্ছি, পথ চিনতে পারবেন তো? অবশ্য পথ এখানে একটিই, এবং সোজাও।

শব্দ পেলাম তিনি পঁইঠা দিয়ে নামছেন।

যে-কথাটা জানবার জন্য আমার এতদূরে আসা—তার তাগিদটা হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল মতিবাবুকে একলা পেয়ে। বললাম, একটা কথা জানবার ছিল---

কি কথা বাবা? বল।

ক্ষানে এই মাত্র যে তর্ক তুললেন সেই সম্বন্ধে একটুখানি কৌতূহল শুধু। যাক গে—সে জেনে আর আমার কি লাভ? বলে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করলাম।

উনি অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে বললেন, তোমরা ছেলের দল সঙ্কীর্ণ নও, জানি। যৌবন কালটাই ছড়িয়ে দেওয়ার কাল কিনা।' আমরা যেমন গুছিয়ে বাঁধছি, বেশী পাচ্ছি না বলে কত মায়া জিনিসের উপর—যা হারাচ্ছি তা পূরণ করে নেবার শক্তি নেই—কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কত না আটুপাটু! 'স্বাস্থ্য চাই শরীরের, স্বাস্থ্য চাই মনের, স্বাস্থ্য চাই সমাজের। অথচ কালের খেলা দেখেছ বাবা —সমস্তর উপর থাবা বসাচ্ছে! যেন বলছে, তুমি চাইলেই আমার দেবার সাধ্য কই! তুমি চাইবে— আমি টানব—তবেই না জমবে খেলা?

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, এই একটু আগে যা বলছিলেন, নিজের মেয়ে সম্বন্ধে দুর্নাম--সে রটলে বাবা হয়ে তাকে ক্ষমা করতে পারেন কি?

তিনি তেমনি কামিনী-ফুল-ঝরা হাসি হেসে বললেন, বয়স তোমার কম, মায়ার বাঁধনে পড়নি বাঁধা—তোমাকে এ-কথার কি উত্তর দেব—বাবা! আমরা সামাজিক জীব—সমাজ ছাড়তে পারি না। বিশেষ করে যার অর্থ নেই— তাকে সামাজিক হতেই হয়। কিন্তু মেয়ের দুর্নামে শুধু সমাজের পীড়নই ব্যথা জমায় না মনে— মনটা যে কি ভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়…! ওঁর গলার স্বর আটকে এল, মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি।

বললাম, মাপ করবেন, জানতাম না।

না, না, অপরাধের কথা নয়। ক্ষমা করার কথা ওঠেই না এতে। ক্ষমা না করতে পারার ব্যথা যেখানে বেশী—ক্ষমা করার কথা সেখানে উঠবে কেমন করে। যাকে চাই, পাওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও

পাই না···সেই কারণেই তো ঝড় ওঠে, জীবনের শূন্যতা ঘোচে না। আবেগে ওঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

পথে পা দিয়ে ভাবলাম—কত সত্য এই কথাগুলি। জীবনের শূন্যতা ঘোচে না বলেই চোখের জলে পিছল হয় পথ। সে পথ বন্ধুর—দুর্গম—অন্ধকারমাখা আর সীমাহীন। সে পথে দিশাহারা ঘুরে বেড়ালে নিষ্ফল জীবনের বোঝা দিন দিন ভারী হয়ে ওঠে না কি?

ভারী বোঝা নিয়ে ফিরে এলাম রাজগীর থেকে। তারপর শহরের পথে—রাস্তায় গলিতে আর পার্কে পার্কে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম শোভাকে। প্রতিদিন সকালে নূতন আশা নিয়ে বার হই পথে—দিন শেষে ভগ্নোদ্যম নিয়ে ফিরে আসি। কেবলই মনে হয়—বাংলাদেশ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও এত বিস্তীর্ণ হয়ে উঠল কি করে—সমুদ্রের সীমা-হীনতা তার বেলাভূমিতেও প্রসারিত। সেই বিস্তীর্ণ বালুবেলায় চিহ্নিত একটি বালুকণাকে কেমন করে খুঁজে বার করব আমি? এই অনুসন্ধানে কি সারা জীবনটা কেটে যাবে?

কবে যেন শুনেছিলাম গানের দু'টি কলি—ফিরে ফিরে বাজতে লাগল কানের কাছে:

মধুনিশি পূর্ণিমার—ফিরে আসে বার বার
সে জন আসে না আর যে গেছে চলে।

দুপুর বেলা। ঘরের দুয়োর বন্ধ করে একখানা বই পড়ছিলাম। বইখানা শোভাকে কিনে দিয়েছিলাম। বইখানা ও প্রায়ই পড়ত—আর পাতায় চিহ্ন দিয়ে রাখত যতটুকু পড়া হত। পাতা উল্টোতেই সেই চিহ্নটি টুপ করে খসে পড়ল। একটি পুরাতন খবরের কাগজের টুকরো। তার সঙ্গে একখানা চিঠি। কৌতূহল হ'ল

কার চিঠি—কে লিখেছে? বাঃ—এ যে শোভার হাতের লেখা, লিখেছে ওব বাবাকে। এটা ঠিক চিঠি নয়—চিঠির খসড়া। শোভা লিখছে :

আপনার শরীর কেমন আছে ও সংসারে কে কেমন আছেন এই পোষ্ট-বক্সের নম্বরে জানাবেন। খবরের কাগজের টুকরোটার ভাঁজ খুললাম—সেই অংশটুকু যা রঞ্জিতের ফাইলে দেখেছি। গ্রামের সংবাদদাতার খবর—দুটি সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারী কন্যার গ্রাম ত্যাগের কাহিনী।

দুয়োরে কে ধাক্কা মারছে। ছায়ার গলা। ছায়া ডাকছে, দাদা—দোর খুলুন - আপনার চিঠি আছে।

চিঠি লিখেছেন মাসীমা। ওঁরা সমস্ত তীর্থ সেবে কাশীতে পৌঁছেচেন দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরবেন। আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন আমাদের। আমাকে আর শোভাকে। একসঙ্গে একই লাইনে দু'জনকে।

কাল আপিসের ছুটি ফুবোবে—কাজে যোগ দিতে হবে। এদিকের অনুসন্ধানও শেষ হয়েছে। রঞ্জিৎ এখনও আশা ছাড়েনি অবশ্য। আমি জানি তা দুরাশাই। যতই মন ভেঙ্গে যাক—চাকরি ছাড়তে পারব না। অন্য কারও প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে না পাবি নিজেব প্রতিও একটা কর্ত্তব্য আছে। চাকরি আমাকে করতেই হবে।

আপিসে আসতেই সহকর্ম্মী অমল বলল, একটা প্রাইভেট খবর আছে দাদা, এদিকে আসুন। আড়ালে এসে বলল, আপনার নামে একটা চার্জ্জ ফ্রেম হচ্ছে, এডাল্‌টি্র।

মানে? চমকে উঠলাম।

একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার কি আলাপ হয়েছিল? তাকে বিয়ে করব বলে চলন্ত ট্রামে ফেলে সরে পড়েছিলেন?

আমার মুখ ছাই-এর মত পাংশু হয়ে গেল। সে অভিযোগ নিয়ে শোভা কি এতদূরে ছুটে এসেছে? কর্ম্মক্ষেত্রে আমার নামে কলঙ্ক রটনা করে ও প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়? সেই নম্র নিরীহ পরিমিতবাক মেয়ে?

মুহূর্ত্তে মন বিরূপ হয়ে উঠল। কার জন্য এত ছুটোছুটি করলাম? কার জন্য অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে মরেছি এই ক'টা দিন? এই মক্ষিরূপিণী মেয়েরা সব পারে। মানুষের স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে এরা নিজেদের জীবিকা সংস্থান করে নেয়।

অমল বলল, একজন প্রৌঢ়া তাঁর সঙ্গে একজন তরুণী এসেছিল। অফিসার ঘোষ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা বলে গেছে। ঘোষ সাহেব নাকি বলেছেন—মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত থাকতে। তিনি বলেছেন—তাঁর আপিসে এমন ব্যাপার কখনই সহ্য করবেন না।

বিরূপ মন নিয়ে নিজের সীটে এসে বসলাম। চারিদিকের কৌতূহলী দৃষ্টির খোঁচা আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরাচ্ছে—ফিস্ ফিস্ কানাকানি চলছে আমাকে নিয়ে। এই অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় বসে কাজ করা যায় কখনও?

চাপরাসী এসে জানাল—সেকসন-ইন্-চার্জ্জ অনাথবাবু ডাকছেন।

অনাথবাবু আমায় নিয়ে সায়েবদের মীটিং-রুমে এসে দরজা বন্ধ করলেন। সামনের চেয়ারে বসতে বলে একটা চুরুট ধরালেন। চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, শোন প্রদ্যুম্ন—তোমার নামে একটা কমপ্লেন্ এসেছে। অবশ্য সীরিয়াস্ নয়। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত বলে—তোমাকে প্রাইভেট কামরায় ডাকলাম। ঘোষ সায়েব আমারই উপর ভার দিয়েছেন এন্‌কোয়ারীর, তাই—

বললাম, আপনারা যা বলবেন জানি, কিন্তু বিশ্বাস করুন এ বিষয়ে আমার কোন হাত ছিল না।

অনাথবাবু নরম গলায় বললেন, সব খুলে বলবে কি? আমাকে তোমার হিতৈষী বলে জেনো—

বয়োজ্যেষ্ঠকে যতটুকু বলা চলে অকপটে বললাম। উনি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত শুনলেন। অবশেষে প্রশ্ন করলেন, তোমার বাবা নিশ্চয় এ ব্যাপার জানতেন না?

বিবাহে মনস্থির করে তাঁকে পত্র দিয়েছিলাম –তিনি সম্মতি দেন নি।

সেটা সম্ভব। আমাদের মত মধ্যবিত্তের ঘরের অভিভাবকরা এ বিষয়ে খুব উদার নন। অবশ্য দোষটা তাঁদেরও সম্পূর্ণ নয়। যে আবহাওয়ায় তাঁরা মানুষ—তার প্রভাব কাটানো সহজ নয়। তাছাড়া সমাজের প্রতাপ আজ না থাকলেও—পরিচিত আত্মীয় স্বজনের মতামতটা মানতে হয়; এটা শহরে যদি বা সম্ভব হয়—গ্রামে কিছুতেই চলে না। যাক সে কথা, এইবার একটু ব্যক্তিগত আলোচনা করব—· আশা করি কিছু মনে করবে না।

ওঁর প্রশ্নের ধরণে উদ্বিগ্ন হলাম। মনে কিছু না করার ভনিতাটা মনে কিছু করার সম্ভাবনাকে প্রবল করে।

অনাথবাবু বললেন, বাপের অমতের ফলাফল নিশ্চয় জান। তেমনই যদি হয়—যা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি তা থেকে বঞ্চিত হলে—তাহলে একটি সংসারের ভার বহন করার ক্ষমতা -

বললাম, চাকরির পয়সায় না চলে অন্য উপায়ে আয় বাড়াতে হবে। দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে- পিছিয়ে পড়ার কোন যুক্তি নেই।

তা যদি নেই—একটু থেমে বললেন অনাথবাবু—তাহলে চলন্ত ট্রামে মেয়েটিকে ফেলে নেমে গেলে কেন?

আরক্ত হয়ে উঠল আমার কর্ণমূল। এ কথার জবাব দেওয়া চলে না। ভালবেসে সন্দেহ করার নীচতাকে প্রকাশ করব কোন্ লজ্জায়? মাথা নীচু করে ঘামতে লাগলাম।

অনাথবাবু বললেন, ট্রাম থেকে নেমে যাওয়াতে সাধারণ লোক এই সন্দেহই কি করবে না যে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করার ভয়ে বুঝি পিছিয়ে গেলে! বলবে নাকি—এ কালের ছেলেদের চরিত্র দুর্ব্বল? ভালবাসা তাদের কাছে বিলাস মাত্র?

উত্তর দেবার কি-ই আছে আমার!

অনাথবাবু স্নিগ্ধস্বরে বললেন, আমি কিন্তু ছেলেদের এমন কাপুরুষ ভাবতে পারি না। ভালবাসাটা যেমন মনের ব্যাপার—তেমনি সেই ভালবাসাকে সম্মান দেওয়াও অনুকূল পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এখন সত্যি করে বলত—বিয়ে না করেও এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন পথ তোমার জানা আছে কি?

বললাম, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। দায়িত্ব যদি এড়িয়ে যাওয়াই আমার ইচ্ছা হয় -দায়িত্ব কেউ চাপাতে পারে কি জোর করে?

পারে বইকি ভাই। অনাথবাবু বললেন। ঘটনাচক্রে মানুষ কিনা হয়—কিনা স্বীকার করে! ধর তোমাদের মেলামেশার ফলে—যদি কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হয়—তাকে তুমি অস্বীকার করতে পার না।

নতমুখে বললাম, না। একটু থেমে বললাম, এ কিন্তু ব্ল্যাক মেইলিং।

না ভাই—মেয়েটি সত্যিই অসহায়। একটু থেমে অনাথবাবু বললেন, মেয়েটি কালও এসেছিল আমাদের আপিসে। ভারী ভাল মেয়ে—ঘোষ সায়েবের বিশ্বাস মেয়েটি নির্দ্দোষ। যে করে হোক এ বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক—এই তিনি চান। আর দেখতে গেলে—তোমার পক্ষেও এটা কর্ত্তব্য।

আমাকে প্রতিবাদ করবার অবসর না দিয়ে অনাথবাবু বললেন, ব্যাপারটা যাতে আদালত পর্য্যন্ত না গড়ায়—সেইটিই আমরা চাই—

আশা করি, এই নিয়ে খবরের কাগজে হৈ চৈ হয় এটা তুমিও চাও না ?

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম, আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন ?

মেয়েটিকে গ্রহণ কর, সব গোল মিটে যাক। অলস্ ওয়েল্ ছ্যাট্ এণ্ডস্ ওয়েল্।

না সম্মত হই যদি—ডিপার্টমেণ্ট্যাল্ অ্যাক্‌সন নেবেন বুঝি ?

আরে—না—না, মোটেই তা নয়। ঘোষ সায়েব চান না তাঁর আপিসের নাম জড়িয়ে কোন কেচ্ছা কাগজে ওঠে। তুমিই ভেবে দেখতো—মেয়েটি আজ কত অসহায়। তুমি যদি ওকে সম্মান না দাও—সমাজে ওব স্থান কোথায় ?

সমাজ! অস্ফুট স্বর বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। মনে মনে বললাম এ সব মেয়ে সমাজের কি তোয়াক্কা বাখে! এবা সুযোগ খোঁজে—কোথায় কোন্ নির্ব্বোধকে ভালবাসাব ছলনায় বেঁধে নিজেব আর্থিক সুবিধাটুকু আদায় কবে নেবে। এদেব কথা বইয়ে পড়েছি –আদালতেব কাহিনাব মধ্যেও আছে, এদেব এড়িয়ে চলার সাধ্য কোথায় আমাদেব।

অনাথবাবু চুরুট ধবিয়ে বললেন, তাহলে ঘোষ সায়েবকে জানাই যে তুমি বাজী ?

বলুন গে।

অনাথবাবু উঠে গেলেন। আমিও উঠলাম।

একশোটি কৌতূহলী দৃষ্টি বাইবে প্রত্যাশা কবছে জানি। জানি, যে পৃথিবীতে এতকাল ছিলাম মাথা উঁচু কবে—অতঃপর সেখানে চলতে হবে মুখ নামিয়ে। পবকে দেব সম্মান—আত্মসম্মানের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিয়ে। পুবাতন পৃথিবী নিঃশেষে মুছে গেল।

বেশ তাই হোক, ভালবাসাব চিতাভস্মে শোভা প্রতিষ্ঠা করুক তার মর্য্যাদাকে। শোভাব মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক।

॥ ৭ ॥

শুভ্রার কথা

নারী আশ্রমের অধ্যক্ষা বললেন, এ জায়গাকে মনে করবে তোমার নিজের বাড়ী। এখানে কেউ তোমায় দয়া করে আশ্রয় দেন নি—নিজের অধিকারে এখানে এসেছ। যারা দীনভাবে আসে এখানে, তাদের কাজে কর্ম্মে বহু ত্রুটি রয়ে যায়—যারা সত্যিকার অধিকারে এই আশ্রমকে ভালবাসতে পারে তারাই এর সম্পদ। আশা করি তোমাকেও আমরা সম্পদ রূপে পাব।

ওঁর কথায় মুগ্ধ হলাম। এখানে কিছুদিন থাকার পর ওঁদের ব্যবহারে এবং আশ্রমের ব্যবস্থায় মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমার মন থেকে হতাশার ভাব কেটে গেল। পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুটিও যে অপ্রয়োজনীয় নয়—এই বিশ্বাস ফিরে এল। এই আশ্রমে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া আর দুঃসহ কল্পনা বলে বোধ হল না।

সেলাই, গান বাজনা, সেবা ও লেখাপড়া সব ব্যবস্থাই আছে এখানে। ঘর গৃহস্থালীর কাজ—যার যেমন রুচি বেছে নিয়েছে। আশ্রম চালাবার জন্য নানা শিল্প ও সূচের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তার আয়ও মন্দ নয়। বাইরের থেকে অর্ডার আসত ফ্রক, পেনি, ইজের, গেঞ্জি, সার্ট, হাফ প্যাণ্ট প্রভৃতি তৈরী করার। ডাল ভাঙ্গা, মশলা গুঁড়ানো, কাগজের ঠোঙা তৈরী করা, কাগজের প্যাকেটে ডালমুট ভরে দেওয়া, পাঁপর বেলা, কোন্‌টা না করছে মেয়েরা। সকলকার পরিশ্রমের আয়ে সুষ্ঠুভাবেই চলছে আশ্রম।

সন্ধ্যায় বড় বারান্দায় বসে পড়ার আসর। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা থেকে আরম্ভ করে—একালের রম্য স্নিগ্ধ রচনা সবই সান্ধ্য-আসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। একজন পড়ে—সবাই শোনে। পড়া শেষ হলে আলোচনা চলে। এমনি করে দেহ আর মন দুই পক্ষকে নিয়ে সদ্ভাবে জীবন যাপনের প্রয়াস দেখা যায়। অধিকাংশ সংসারে দেহ যদি বা শরীর পোষণের উপযোগী বস্তু পায়, মন থাকে উপবাসী। উপবাসী মনে প্রবৃত্তির উৎপাত বড় কম নয়। বড় বড় তত্ত্বকথা, দৃষ্টান্ত, উপদেশ সবই মিথ্যে হয়ে যায়—যদি চোখের সামনে উজ্জ্বল আলো না জ্বেলে দেয় কেউ। এখানে আলো জ্বালার ব্যবস্থা রয়েছে, পথ অন্ধকার নয়।

হোষ্টেলের মাসীমা প্রায়ই আসেন। জিজ্ঞাসা করেন, কেমন লাগছে? আমার মুখ থেকে কোন উত্তর না শুনলেও আমার চোখে-মুখে যা লেখা থাকে তাতেই উনি প্রসন্ন হন। বলেন, তোমায় লেখাপড়া শিখবার ব্যবস্থা করে দেব শুভ্রা তাহলে জগৎটাকে আরও ভাল লাগবে।

একদিন মাসীমা বললেন, শুভ্রা, মনে আছে তো কাল আমাদের ডালহৌসি স্কোয়ারে যাবার কথা। প্রদ্যুম্ন নিশ্চয় আপিস আসছে।

বললাম, নাই বা গেলাম সেখানে।

সে কি! উনি আশ্চর্য্য হলেন।

বললাম, মাথা গোঁজবার ঠাঁই কোথায় পাব এই ভাবনাই বড় হয়েছিল—সে ভাবনা তো মিটেছে মাসীমা।

বললেন, মাথা গুঁজে কোন রকমে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

আমার জীবনে আর কোন্ উদ্দেশ্য বা থাকতে পারে। আমি সেখানে যাব না—মাসীমা।

উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সে তোমার ইচ্ছা। ঘর তুমি না বাঁধতে চাও—বেঁধো না, কিন্তু তোমার সৎ পরিচয়টা

অন্তত সমাজে রেখে যাও। এ আমার কথা নয় শুভ্রা, তোমারই কথা।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম মাসীমার কথা। পৃথিবীতে কোন একটি মানুষের পরিচয় কতদিন থাকে!

মানুষ মহৎ হোক—দুর্বৃত্ত হোক—ত্যাগী কিংবা অত্যাচারী যাই হোক—প্রেমের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করুক—কিংবা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিক—সে পরিচয় তার কতটুকু কালের জন্য? এদের কারও উপর মহাকালের মমতা নাই—সব কিছুকে বিস্মৃতির তুলিকায় মুছে নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে।

তবু আমার কর্ত্তব্য আমায় অব্যাহতি দেবে না। তুচ্ছ বস্তু নিয়ে আমাদের ক্ষণকাল অসামান্য হয়ে ওঠে। তুচ্ছ বস্তুকে ত্যাগ করলে চলবে কেন!

পরের দিন মাসীমাকে নিয়ে ডালহৌসির দিকে চললাম। বললাম, মাসীমা, এটাও হয়তো আমার লোভ—লোলুপতা। যত অপ্রীতিকর হোক এ জিনিস, এ লাভ করতেই হবে আমাকে। এর বেশী কিছু চাই না।

উনি বললেন, প্রদ্যুম্ন যদি তোমায় ডাকে? তার ডাক ফিরিয়ে দেবে কোন্ সাহসে?

সাহস নয় মাসীমা, ওটা অহঙ্কারই। আমার ভালোবাসা যদি সার্থক হতো তাতেই ঘর বাঁধতে পারতাম। ঘর না পেয়ে জীবন নষ্ট হবে—এই বোধ এখন আর নেই, এখন ঘরে আমার প্রয়োজন কি! তিনি দূরে চলে গেছেন বলেই তাঁর ডাক আর শুনতে পাব না।

মাসীমা হেসে বললেন, এত বয়স হল— মনটাকে চিনতে পারলাম না, আর তুমি এই অল্প বয়সে তার লাগাম কষে ধরেছ! ধন্য শক্তি তোমার!

নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর কি আশ্চর্য্য শক্তি—এ কথা মাসীমাকে জানানো আমার সাজে না। চুপ করে রইলাম।

আশ্বস্ত হয়ে ফিরলাম। আগামী কাল প্রত্যুম্ন আফিসে এলে ওঁর উর্দ্ধতন অফিসার সব ঠিক করে দেবেন বললেন। প্রত্যুম্নকে অনুরোধ করে? না, শাসন করে? কেবলই মনে হচ্ছিল—কি প্রয়োজন ছিল এর? যার জন্য এত আয়োজন—এত বাঁধন-কষণ—সেই বস্তুই তখন অলক্ষিতে কোথায় অন্তর্দ্ধান করবে, কে জানে। অধিকার আদায় করলেই কি মানুষটা আসে মুঠোর মধ্যে? আর মানুষটা মুঠোর মধ্যে এলেই কি যা চেয়েছি তা পেয়ে যাব!

পরের দিন এলেন মাসীমা। বললেন, ছেলেটি রাজী হয়েছে বিয়ে করতে। হিন্দুমতেই বিয়ে হবে।

বললাম, ওর উপর চাপ দিয়েছে বুঝি আপিস থেকে?

সে খোঁজে কি দরকার আমাদের।

না মাসীমা, ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী লাগছে। ওদের আপিসে যেতে পারব না আমি।

সে কি আমি বুঝি নে? আমি বলেছি ওকে লালদীঘিতে আসতে --তোমাকেও যেতে হবে সেখানে। এ সব ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই লজ্জা—

লজ্জা কিসের? তুমি ত নিজের স্বার্থে কিছু করছ না। তুমি সমাজকে সম্মান দিতে চাইছ –সে দায়িত্ব কি প্রত্যুম্নেরও নয়? ওইখানেই তোমাকে বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

লজ্জা কিসের—কাকে বোঝাবো! নীচু হয়ে চাওয়ার হীনতা সইব কেমন করে! এ অহঙ্কারের কথা নয়। যদি অহঙ্কারই হয়-- ভালবাসার খাঁটি সোনায় ওটুকু খাদ না মিশিয়ে উপায় বা কই! তুমি আর কারও নও আমার, মুক্তকণ্ঠে এই ঘোষণা না করতে পারলে ভালবাসার বড়াই কেন!

সাদাসিধে একখানা কাপড় পরে মাসীমাকে বললাম, চলুন!

উনি বললেন, হাতে আমাদের যথেষ্ট সময়—কাপড় ছেড়ে ভাল কাপড় পর, চুলটা গুছিয়ে নাও। আর ভাল ছিটের ব্লাউস—

না মাসীমা, মন ভোলাতে পারব না আমি। তার চেয়ে যদি মরে যাই, সে-ও ভালো।

বোকা মেয়ে! আমার কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে হেসে উঠলেন।

লালদীঘিতে আমাকে বসতে বলে, মাসীমা চলে গেলেন। সেই পুরাতন জায়গায় এসে বসেছি—সেই পামকুঞ্জে। সামনে নিস্তরঙ্গ দীঘির জল, উপরে বর্ণহীন আকাশ। ক্বচিৎ সে আকাশে দুএকটি পাখী উড়ে যাচ্ছে। চারিদিকের অতিকায় সৌধগুলি প্রাচীর তুলেছে লালদীঘির পাড়ে পাড়ে। দীঘিকে বেষ্টন করে অতিকায় সরীসৃপেব মত ট্রাম চলেছে, চলেছে মোটর, বাস, লরী, সাইকেল। এদের গতিবেগে মনে হচ্ছে সারা শহরটাই চলছে। আর আমি যুগ-যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করে আছি—তারই একটি প্রান্তে। বেলা গড়িয়ে আসছে—আকাশ কোমল হয়ে উঠছে—মেঘের রাজ্যে আলপনা দেওয়া সুরু হয়েছে। দূর থেকে কখনও ভেসে আসছে ঘড়ির মৃদু সুরময় ঘণ্টার শব্দ—কখনও বা ঘর্ঘর নাদে ট্রাম সেই সুরকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। পথে লোকের স্রোত ঘন হয়ে উঠছে—তার ধারা দীঘির পথে এসে পৌছল। ওই জনস্রোতের মধ্যে প্রদ্যুম্নকে খুঁজে নিতে পারব কি?

কি জানি—আমার বুক কাঁপছে কেন? স্রোত যত উত্তাল হচ্ছে—মনও হচ্ছে তত উতলা। প্রিয়ের দর্শন আশায় উত্তেজিত হয়ে উঠছে স্নায়ু- প্রিয়সান্নিধ্য লাভের ব্যাকুলতায় চঞ্চল হচ্ছে রক্তস্রোত? না, না, প্রদ্যুম্ন মিশে যাক ওই ঘন স্রোতে—এই প্রতীক্ষার দুঃসহ লজ্জা গ্লানি আমি যে বইতে পারছি না আর।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হল—ছড়িয়ে পড়ল দীঘির জলে,

দীঘির পাড়ে। সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একটি মানুষ—দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ দৃপ্ত তার চলার ভঙ্গী, স্বপ্নাতুর ছু'টি ভাসন্ত চক্ষু। তার ঋজু দেহের বেশবাসে প্রচুর স্বাস্থ্য উপচে পড়ছে। তরল ছায়ার মধ্যেও তার শ্যামবর্ণের মাধুরী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এ যেন সেই ঃ

আমার মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমাবে করেছি রচনা।

দুরু দুরু বুকে উঠে দাঁড়ালাম আমি। দীর্ঘক্ষণের চিন্তায় যত লজ্জা যত গ্লানির বোঝা জমেছিল—সব যেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। সেই ট্রামে-আসার সকাল বেলাতে পৌঁছলাম আমি।

প্রত্যুম্নর পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলাম ওর নাম ধরে। আবেগে আবেশে কণ্ঠেব ধ্বনি হয়ত কণ্ঠের মধ্যেই রয়ে গেল—প্রত্যুম্নও দাঁড়াল আমার সামনে।

অতি কষ্টে বললাম, আমি বিকেল থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা কবছি।

প্রত্যুম্নর চোখে মুখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় বা ব্যগ্রতা ফুটল না। ও যেন নিশ্চিত জানে—আমি এমনি সময়ে এসে এই কথাটিই বলব।

কোন কথা না বলে প্রত্যুম্ন এগিয়ে গেল, আমি ওর পাছু নিলাম। অনেক কষ্টে আত্মসংববণ করে বললাম, সেদিন ট্রাম থেকে নেমে গেলে কেন?

প্রত্যুম্ন শুধু একবার মুখ তুলে চাইল—কোন উত্তর দিল না।

আমার বুকে কে যেন ভাবী পাথর চাপিয়ে দিলে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললাম, কেন চলে গিছলে বলবে না?

দরকার নাই। সংক্ষিপ্ত গম্ভীর স্ববে জবাব দিল ও।

আর উচ্ছ্বাস দমন করতে পারলাম না—ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম, আমার যে শোনবার দরকার আছে। তুমি ত্যাগ করলে আমি দাঁড়াই কোথা?

প্রত্যুম্ন ত্বরিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল আমার দিকে। কি তীব্র দৃষ্টিতে ও চাইল। বলল কঠিন স্বরে, তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই, না?

সে তো তুমি জান। আঘাত সামলে কোনমতে বললাম।

প্রত্যুম্ন বলল, জানতাম না, এখন জানলাম।

চম্‌কে উঠলাম ওর শ্লেষ-তিক্ত কণ্ঠস্বরে।

প্রত্যুম্ন বলল, বেশ। যা তুমি চাও তাই পাবে—তোমাকে মর্য্যাদা দেব।

ব্যাকুলস্বরে বললাম, ভুল বুঝো না আমায়।

ভুল? ভুল বোঝবার সুযোগ তো দাওনি তুমি—ভুল বুঝব কেন! একটু থেমে বলল, কিন্তু একটা কথা ভাবছি—মর্য্যাদা দিলেও ঘর তোমায় দিতে পারব কি! জানই তো, বাবা এ বিয়েতে মত দেন নি। সেখানে আমার জায়গা নেই।

বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করে উঠল। ব্যথা চাপতে গিয়ে কেঁপে উঠল সারা দেহ। হয়তো টলে পড়ে যেতাম, প্রত্যুম্ন তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে ফেলল। বলল, নীচের দিকে চেয়ে চল, এক্ষুনি পড়ে যাচ্ছিলে।

প্রত্যুম্নর স্পর্শ আমাকে আরও কাতর আরও বিহ্বল করল। যে অশ্রু এতক্ষণ অতি কষ্টে চেপে রেখেছি—তা বুঝি আর শাসন মানে না। কিন্তু অশ্রুভারে ভেঙ্গে পড়লে ওকে সব খুলে বলার অবসর পাব না যে। প্রত্যুম্ন এখনও আমার হাত ধরে রয়েছে। কত নিকটে রয়েছে প্রত্যুম্ন, তবু ওকে ঠিকমত অনুভব করতে পারছি না। মনের মাঝে ঝড় বইছে একটানা, সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

না, এভাবে অভিভূত হলে ভুল বোঝাবুঝির জের মিটবে না। এই মুহূর্ত্তে সব বলব। কেন চাইছি মর্য্যাদা? বাবা কোনদিন যেন মনের কোণেও অভিযোগ তুলতে না পারেন—আমার জন্য ওঁর মাথা

হেঁট হয়েছে। মিতার সঙ্গে আমার নাম কেউ যেন এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ না করে। যা আজীবন এড়িয়ে চলেছি—পাক-চক্রে সে জিনিস কলঙ্ক-পসরা হয়ে মাথায় না চাপে।

চলতে চলতে হাত ছেড়ে দিল প্রদ্যুম্ন। বলল, ভয় নেই, পালাব না। আর পালিয়েই বা যাব কোথায়—আপিসটা যখন চিনেই রেখেছ!

পায়ের তলাকার মাটি আবার কেঁপে উঠল। আমার মর্ম্মব্যথা না বুঝে ও কি শ্লেষের চাবুক দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করেই যাবে! ভালবাসাকে মনে করবে ফাঁদ পাতার কৌশল?

প্রচণ্ড উত্তাপে কখন চোখের জল শুকিয়ে গেছে, মনের মাঝে ঝড়ের বেগ বেড়েই চলেছে। সেই ঝড়ের বেগ আমায় ঠেলে দিল সামনের দিকে। ছুটে বার হয়ে পড়লাম লালদীঘি থেকে। চৌমাথায় একটা ট্রাম সবে নড়ে উঠেছে—ছুটতে ছুটতে তারই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তবু কি ঝড় থামল? মন থেকে বাইরে বেরিয়ে সে দাপাদাপি সুরু করল। ট্রামটা একটু চলেই ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গেল—চারিদিক থেকে কলরব করতে করতে লোকজন ছুটে এলো ট্রামের দিকে—ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ডালহৌসি স্কোয়ারের চওড়া মোড়ে। বাস, ট্যাক্সি, লরী, বাইক—ঝড়ে-ওড়া পাতার মত জমে উঠল ট্রামের চারিদিকে।

এক জায়গায় মানুষরা চাপ বেঁধে হায় হায় করতে লাগল। দুর্ঘটনা হয়েছে। কে নাকি ট্রামের ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়েছে পথে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছে।

কে—কে?

কৌতূহল ধাক্কা দিয়ে মনের ঝড়কে বা'র করে দিল। ঝুঁকে পড়লাম জানালায়। কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে চাইতেই সেই ঝড় দশগুণ শক্তি নিয়ে মনের মধ্যে ফিরে এলো। লাফিয়ে পড়লাম

ট্রাম থেকে। পাগলের মত তু'হাতে ভিড় ঠেলে সামনে এগুতে লাগলাম।

তখন চারদিকে নানান মন্তব্য।

কি করে পড়লো হে ছোক্‌রা ?

লাফিয়ে ট্রামে উঠতে গিয়েছিল, তারপর পা ফস্‌কে—

পরের ট্রামে গেলেই বা কি ক্ষতি হতো ?

ওর আত্মীয় যে ওই ট্রামে উঠেছিল। এই যে—আসুন—

হাঁটু গেড়ে বসলাম প্রত্যুম্নর সামনে। ওর ভূমিলুণ্ঠিত মাথাটি কোলে তুলে নিলাম। ও চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়েছে। হৃদয়ের সব দ্বন্দ্ব সব জ্বালার বুঝি শেষ হয়েছে। কপালে, গালে, হাতে সর্ব্বদেহে লাল কুম্‌কুমের দাগ। উৎসব-শ্রান্ত মুখখানি আলস্যের ছোঁয়ায় ঈষৎ মেতুর।

একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, ট্যাক্সি এসেছে—ওঁকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

ট্যাক্সিতে ওরাই ধরাধরি করে তুলে দিল প্রত্যুম্নকে।

ছেলেটি বলল, আমি সঙ্গে যাব কি ?

আসুন। বিমূঢ়ভাবে বললাম।

সারা পথ কোন দিকে চাইলাম না—প্রত্যুম্নর পানে চেয়ে রইলাম। মনে তখন নানান প্রশ্ন ঢেউ তুলেছে। ও কেন ট্রামে উঠতে গেল অমন করে ? আমাকে কি বলতে এসেছিল কোন কথা ? নিজের ভুলের জন্য অনুতাপ জেগেছিল কি মনে, না আমার ভুল সংশোধন করে দিতে এসেছিল ? আমি সত্যিই কি মুছে গেছি ওর মন থেকে ? ও কি অনেক দূরের মানুষ ? অনেক দূরের—শত চেষ্টা করেও যার নাগাল পাওয়া যায় না ?

রাস্তার মোড়ে গাড়ী দাঁড়াল খানিকক্ষণ। আবার চলল। প্রত্যুম্ন যেন নড়ে উঠল। গাড়ীর দোলা কি ?

না, না, সুপ্তির ঘোর কেটে যাচ্ছে—ঘুমের ছায়া পাতলা হচ্ছে ওর মুখমণ্ডলে। অবশেষে চোখ চাইল প্রদ্যুম্ন।

শ্রান্তকণ্ঠে বলল, আমি কোথায়?

ছেলেটিও সামনের সিট থেকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল। সেই জবাব দিল, আপনাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাচ্ছি। ট্রাম থেকে পড়ে গেছলেন—

ও। এতক্ষণে পূর্ণজ্ঞানে উদ্ভাসিত হ'লো ওর মুখ। আমার পানে চেয়ে বলল, পড়ে গিয়েছিলাম?

কোন উত্তর দিলাম না। অন্যদিকে মুখ ফেরালাম।

প্রদ্যুম্ন স্বরে জোর দিয়ে বলে উঠল, গাড়ী ফেরাও, কলেজে যাব না আমি।

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে বলল, সে কি—আপনি যে—

না, না। আরও দৃঢ় হল প্রদ্যুম্ন। কোন ডাক্তারখানায় নিয়ে চল-- ফাস্ট এড্ পেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

প্রদ্যুম্ন পূর্ণজ্ঞান পেতেই আমার সঙ্কোচ বেড়ে উঠেছিল। ওর মাথার উপর থেকে ডান হাতখানা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে চাইলাম।

প্রদ্যুম্ন চেপে ধরল হাতখানা।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, কলেজে যাওয়া যে দরকার।

না—বাড়ী যাব আমি।

চম্‌কে ফিবে চাইলাম। আমার হাতখানা কখন টেনে নিয়েছে ওর বুকের ওপর। কখন আমার হাতে ঝরে পড়েছে দু'চার ফোঁটা অশ্রু। হৃদয়ের অসহ্য-ব্যথা-গলানো উষ্ম অশ্রু।

অশ্রু-ভেজা স্বরে ও ডাকল, শুভ্রা।

যা বলতে চেয়েছিলাম—যা শুনতে চেয়েছিলাম সব কিছু ওই দু' অক্ষরের স্নিগ্ধ সম্বোধনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

ফুরিয়ে গেল পুরাতন পৃথিবী, আমরা উত্তীর্ণ হলাম নূতন জগতে।

—শেষ —

